KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M T. AMER LANE, KOLKATA-700009

Record No.: KLMLGK 2007	Place of Publication: ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection: KLMLG	Publisher: আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title: সমকালীন (SAMAKALIN)	Size: 7"x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number: 22/- 22/- 22/- 22/- 22/-	Year of Publication: মাঘ ১৩৮০ ॥ Feb 1974 ফাল্গুন ১৩৮০ ॥ March 1974 ভাদ্র ১৩৮১ ॥ Sep 1974 কার্তিক ১৩৮১ ॥ Nov 1974 অগ্রহায়ণ ১৩৮১ ॥ Dec 1974
	Condition: Brittle Good ✓
Editor: আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks:

C.D. Roll No.: KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

দ্বাবিংশ বর্ষ ॥ ফাল্গুন ১৩৮১

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

যে কোনও দিনই সঞ্চয়ের দিন যদি.........

আপনি সঞ্চয় করবেন বলে মনস্থির করেন। আর সেটা মাস পয়লায় মাইনে হাতে পেলে শুরু করা যায়। তবে মনস্থির করতে না পারলে মাইনের টাকা হাতে আসলেই খরচ হয়ে যায়।

সঞ্চয় করতে যখন মনস্থ করবেন (সেটা এখনই করা সব চাইতে ভালো নয় কি?) তখন ডাকঘরের রেকারিং ডিপজিট অ্যাকাউন্টের কথাটা ভেবে দেখবেন। মাসে মাসে মাত্র দশ টাকা করে জমালে, তা পাঁচ বছরে বেড়ে 750 টাকায় দাঁড়াবে। তাতে চক্রবৃদ্ধি সুদের হার দাঁড়াচ্ছে 9.25%।

আর আপনি একটানা দু'বছর যদি নিয়মিত সঞ্চয় করে যান তাহলে আপনার টাকা বীমার মত সুরক্ষিত থাকতে পারে এমন ব্যবস্থা আমরা রেখেছি। তা হ'ল, অ্যাকাউন্ট হোলডার বা জমার খাতার মালিকের অসময়ে মৃত্যু ঘটলে বাকী কিস্তির টাকা আর জমা না পড়লেও 750 টাকা অক্ষত থাকবে।

বিশদ জানতে হলে:
নিকটতম ডাকঘরে খোঁজ নিন
কিংবা
ন্যাশনাল সেভিংস অর্গানাইজেশান
পোস্ট বক্স নং 96
নাগপুর

dacp 74/550

দ্বাবিংশ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ফাল্গুন তেরশ' একাশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও ব্রাহ্মসমাজ ॥ মধু ঘোষ ৪৩১

রামব্রহ্ম সান্যাল ও শতবর্ষ পূর্বের ব্যাঘ্র-বিবরণ ॥ সন্তোষকুমার বসু ৪৩৬

সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাজেয়াপ্ত গ্রন্থাবলী ॥ সোমেন্দ্রনাথ বসু ৪৪৪

লেখন ও তার লিখনপ্রণালী ॥ পূর্ণচন্দ্র দাস ৪৫০

মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্ত ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর ৪৫৫

সমালোচনা: বাঙালী জীবনে বিবাহ ॥ বিমল মজুমদার ৪৬৩

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

নগদ 100 টাকা
পেতে পারেন

কারও বসন্ত হওয়ার
খবর দিতে পারলে

কারও জ্বরের সঙ্গে গায়ে লালচে দানা দানা বেরিয়েছে বলে যদি আপনি খবর পান এবং তা বসন্ত বলে সন্দেহ হয়, তাহলে নীচের যে কোনও ঠিকানায় অবিলম্বে খবর দিন ঃ

নিকটতম স্বাস্থ্য কেন্দ্র/উপকেন্দ্র/টীকা-দান ও জন্ম রেজিস্ট্রীকরণ কেন্দ্র/গৌর স্বাস্থ্য দপ্তর/জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর

আপনার দেওয়া খবর যদি সত্য বলে প্রতিপন্ন হয় এবং সে খবর আপনার আগে আর কেউ না দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি হাতে হাতে নগদ একশ টাকা পুরস্কার পাবেন।

davp 74/410

ফাল্গুন
তেরশ' একাশী

সমকালীন

বাবিংশ বর্ষ
১১শ সংখ্যা

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও ব্রাহ্মসমাজ

মঞ্জু ঘোষ

ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্মধর্ম বললে দু'জন মনস্বীর চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে। এরা হচ্ছেন রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রামমোহন রায় ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র কলকাতার চিৎপুর রোডে কমলবসুর বাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কোন একটি সংগঠন শুধু প্রতিষ্ঠা করলেই হয় না, তার ধারক ও বাহকরূপে কিছু পৃষ্ঠপোষকের প্রয়োজন। রামমোহন যখন এদেশে ছিলেন তখন কিছু পৃষ্ঠপোষকের দেখা মিলেছিল, কিন্তু ১৮৩০ খ্রী: ১৯ শে নভেম্বর তিনি যখন ইংলণ্ডে যাত্রা করলেন তখন অনেক কিছুই বিপর্যস্ত হয়ে গেল। বস্তুত রামমোহনের একেশ্বরবাদকে তখন খুব কম লোকই মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। কলকাতার রক্ষণশীল সমাজ প্রধানত রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে নানাভাবে রামমোহনের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। তাই একদিকে সনাতন হিন্দুধর্মের লোকদের বিরুপতা এবং অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ রামমোহনের স্বদেশত্যাগ এই দুই ঘটনাই নবঅঙ্কুরিত ব্রাহ্মসমাজকে বিনষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তারমধ্যে একজনের আন্তরিক চেষ্টা সেদিন ব্রাহ্মসমাজকে টিকিয়ে রেখেছিল এবং তার বিস্তারলাভে সাহায্যও করেছিল। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সেই ব্যক্তিত্ব যিনি ব্রাহ্মসমাজকে প্রথমযুগের সম্ভাব্য বিনষ্টির হাত হতে উদ্ধার করেছিলেন। যে ব্রাহ্মসমাজ একদিন বাংলাদেশের জীবন ধারায় এক প্রবল আলোড়ন সঞ্চার করেছিল এবং এমনকি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ও প্রেরণায় একটি নূতন সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল তা হয়তো সম্ভব হতো না যদি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই প্রতিষ্ঠানটিকে সেদিন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালন না করতেন। রামমোহনের বিদেশ যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের কি অবস্থা হলো ; তিনি নিজেই বা 'সমাজের' জন্য কতটুকু করে

যেতে পেরেছিলেন এবং তারপরে বিদ্যাবাগীশ-ই বা ব্রাহ্মসমাজকে কোথায় উন্নীত করেন তা আলোচনা করলে রামচন্দ্রের ভূমিকা স্পষ্ট হবে।

রামচন্দ্র প্রথম যখন রামমোহনের কাছে আসেন তিনি তখন কলকাতায় বসবাস শুরু করেছেন। রামমোহনের জীবনের এই কালকে আমরা তাঁর ধর্মমত বিকাশের কাল বলতে পারি। রামচন্দ্র এই সময়ে তাঁর কাছে এসে তাঁর ধর্মমতকে বরণ করেন এবং তাঁকে 'গুরু' বলে সম্বোধন করেন।

১৭৬৭ শকের ১লা বৈশাখ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় বিদ্যাবাগীশের যে জীবনবৃত্ত প্রকাশিত হয় তা থেকে জানা যায় ১৭০৭ শকের ২৯ শে মাঘ বিদ্যাবাগীশ পালপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। এঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার 'হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী'—এই নাম ধারণ করে নানা দেশ পর্যটন করেন। রামমোহনের সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। হরিহরানন্দ মহানিধান-তন্ত্র অনুযায়ী ব্রাহ্মোপাসনা করতেন; রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পিছনেও এঁর প্রভাব অনেক কাজ করেছিল। এই হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী-ই রামচন্দ্রকে কলকাতায় আনেন এবং রামমোহনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। রামচন্দ্র দেশে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন এবং পঁচিশ বছর বয়সে শান্তিপুরের রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতির কাছে স্মৃতি পাঠ করেন। "বিদ্যাবাগীশ" উপাধি তিনি ঐ সময়েই লাভ করেন। বিদ্যাবাগীশকে কাছে পেয়ে এবং স্মৃতি শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতা দেখে রামমোহন অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করেন। শিবপ্রসাদ মিশ্র নামক একজন পণ্ডিতের কাছে তিনি বিদ্যাবাগীশকে উপনিষৎ ও বেদান্ত দর্শনাদি পাঠে নিযুক্ত করেন।

১৭৩৭ শকে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য রামমোহন কলকাতায় 'আত্মীয় সভা' নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। আত্মীয় সভার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মানুশীলন, সত্যানুসন্ধান এবং ধর্মীয় বিষয় সমূহের খোলাখুলি আলোচনা। এই সভায় কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হতে বহুসম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যোগদান করতেন। তবে যাঁরা এই সভায় নিয়মিত যোগদান করতেন তাঁদের সকলেরই উদ্দেশ্য যে কিছু ধর্ম-সংক্রান্ত আলোচনা তা ছিল না। রামমোহন ছিলেন সেকালের একজন ধনশালী এবং প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। কাজেই বেশীর ভাগ লোকই জাগতিক ব্যাপারে পরামর্শের জন্যই রামমোহনের 'সভা'য় যোগ-দিতেন। এই 'সভা'য় যাঁরা নিষ্ঠাবান ধর্মোপাসক ছিলেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজন। তিনি এই 'সভা'য় উপনিষৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা করতেন। কয়েক বছর পর এই অধিবেশন আপনা হতেই বন্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ ঐ ব্যাপারে উৎসাহী লোকের সংখ্যা আসলে ছিল খুব কম।

১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র রামমোহন কলিকাতায় চিৎপুর রোডে কমলপুর বাড়ীতে 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি শনিবারে সন্ধ্যাকালে সেখানে ব্রহ্মোপাসনা হতো। প্রথমে দু'জন তেলেগু ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করতেন। তারপর উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষৎ পাঠ করতেন এবং শেষে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপদেশ দিলে গান হয়ে এই সভার কাজ সমাপ্ত হতো।

এর অল্প দিন পরেই ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ রামমোহন নূতন বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজকে স্থানান্তরিত করেন। প্রতিষ্ঠার দিনে সেই ভবনের ট্রাষ্টডীড্ হতে বচন উদ্ধৃত করে বলা হলো যে—"ঐ ভবন জাতি বর্ণ সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানবের ব্যবহারার্থ থাকিবে; এবং সেখানে একমাত্র নিরাকার সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা হইবে; তদ্ভিন্ন তথায় কোনও পরিমিত দেবতার পূজা হইবে না"।

এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার তদানীন্তন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং একযোগে এই 'সমাজ' বিচ্ছিন্ন করে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব সারথি হয়ে 'ধর্মসভা' নামে এক সভা স্থাপন করলেন। মতিলাল শীল কলুটোলাতে এই সভার আর একটি শাখা স্থাপন করলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি আগে থেকেই রামমোহনের ভাবনার বিরোধী ছিলেন, তিনি দ্বিগুণ উৎসাহের সঙ্গে সনাতন হিন্দু ধর্ম প্রচারে উৎসাহী হলেন। ধর্মসভার যেদিন অধিবেশন হতো সেদিন শহরের ধনীদের গাড়ীতে রাজপথ ভরে যেত এবং সভাতে তাঁদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল কিভাবে রামমোহনের ধর্মকে সমূলে বিনাশ করা যায়। সতীদাহ নিবারণ ও ব্রহ্মসভা স্থাপনের ফলে কলকাতার হিন্দুরা এত উত্তেজিত হয়েছিলেন যে সতীদাহ প্রথা নিবারক বিষয়ক আইন রদ করবার জন্য এক আবেদন পত্রে বহুসংখ্যক লোকের সাক্ষর হতে লাগলো; অন্যদিকে রামমোহন লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ককে সহমরণ নিবারণের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করবার উদ্দেশ্যে যে অভিনন্দন পত্র লিখলেন তাতে তাঁর দু'একজন বন্ধু ছাড়া আর কেউ স্বাক্ষর করলেন না।

রামমোহন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে যখন এই রকম একটি শক্তিশালী দল মাথা তুলে উঠেছিল তখনই রামমোহন ইংলণ্ড যাত্রা করলেন। রামমোহনের অনুপস্থিতিতে এই 'সমাজে'র সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়লো রামচন্দ্রের উপর। রামচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতি-সাপ্তাহিক অধিবেশনে রামমোহন রায় রচিত অথবা স্বরচিত উপনিষৎ-ব্যাখ্যান পাঠ করতেন। রামমোহনের বিলাত যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত এর থেকেই বোঝা যায় যে, ব্রাহ্মসমাজের স্থাপন অবধি প্রায় অবিচ্ছেদ্য ভাবে তিনি বেদীতে আসীন ছিলেন এবং তিনি প্রায় একা-ই এই শিশু ব্রাহ্ম-সমাজের ভার হাতে তুলে নিয়েছিলেন। কয়েক বছরের মধ্যে সমাজের সভ্যগণ একে ত্যাগ করে চলে গেলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের অনুরাগ এত প্রবল ছিল যে কোন কিছুতেই তাঁর বিকার ঘটলো না। রামচন্দ্রের এই অনুরাগকে নিয়মিত অর্থ সাহায্যে সংবর্ধিত করলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। তিনি সমাজের ভিতরকার কোন অংশে দৃষ্টি দিতেন না। শিবনাথ শাস্ত্রী রামচন্দ্রের এই নিষ্ঠার কথা উল্লেখ করে বলেছেন—

To him, for some years, it was a melancholy task, like the daily lighting of a solitary lamp in a grave-yeard. ব্রাহ্মসমাজের এই অবস্থা বেশ কিছুদিন চলেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না রামচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের হাতে 'সমাজে'র দায়িত্ব ভার অর্পণ করেন।

দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে বাল্যকাল হতেই রামমোহনের কার্যকলাপের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর আত্মজীবনীতে সশ্রদ্ধার বহু কাহিনী পাওয়া যায়। কিন্তু রামমোহন দেবেন্দ্রনাথের হাতে ব্রাহ্মসমাজকে তুলে দিয়ে যেতে পারেননি, কারণ তাঁর দেশ ত্যাগের কালে দেবেন্দ্রনাথের বয়স ছিল মাত্র তের বছর। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ-ই দেবেন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মসমাজের উত্তর সাধক রূপে স্থির করে তাঁর হাতে 'সমাজ'কে তুলে দেন।

দেবেন্দ্রনাথের জীবনের এক নাটকীয় সন্ধিক্ষণে ভগবৎ দত্ত আশীর্বাদের মতই আত্মিক যোগাযোগ ঘটে গেল রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সঙ্গে। পিতামহীর তিরোধানের পর অশান্ত বৈরাগ্য ভারে তরুণ দেবেন্দ্রনাথ তখন অবসন্ন; এমন সময়ে হাওয়ায় ভেসে এল ঈশোপনিষদের শ্লোকবাহী একটি পৃষ্ঠা। দেবেন্দ্রনাথ এই অচেনা সংস্কৃত গ্রন্থের পাতার লেখাটি তাঁর শিক্ষক শ্যামচরণের কাছে নিয়ে যান এবং

এর অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। তিনি এই লেখার অর্থ উদ্ধারে অক্ষম হয়ে বলেন—"এতো সব ব্রহ্মসভার কথা। ব্রহ্মসভার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বুঝিতে পারেন"। দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশকে ডাকলেন। তিনি এসে পাতাটি পড়লেন—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।

এবং দেবেন্দ্রনাথকে এর অর্থ বুঝিয়ে দিলেন। রামচন্দ্রের এই ব্যাখ্যা মহর্ষির অন্তরে পরমলোকের প্রথম আলো বয়ে এনেছিল। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন—

'যখন ইহার অর্থ বুঝিলাম, তখন স্বর্গ হইতে অমৃত আসিয়া আমাকে অভিষিক্ত করিল। আমি মানুষের নিকট হইতে সায় পাইতে ব্যস্ত ছিলাম, এখন স্বর্গ হইতে দৈববাণী আসিয়া আমার মর্মের মধ্যে সায় দিল, আমার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইল।'

এর পরই শুরু হলো বিদ্যাবাগীশের কাছে দেবেন্দ্রনাথের উপনিষৎ পাঠ। উপনিষদের প্রতি কথা তাঁর জ্ঞানকে উজ্জ্বল করতে লাগলো। তিনি বলেছেন—'উপনিষদকে অবলম্বন করিয়া আমি দিন দিন আমার গম্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।'—এই পথের প্রদর্শক হলেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

শুধু উপনিষৎ থেকে জ্ঞান আহরণ করেই মহর্ষি ক্ষান্ত হলেন না—এই সত্যধর্মকে প্রচারের ইচ্ছা তাঁর অন্তরে প্রবল হয়ে উঠলো। বাড়ীর সবাই যখন দুর্গাপূজা নিয়ে ব্যস্ত তখন তিনি বাড়ীর পুষ্করণীর ধারে একটি ছোট কুঠরী চুণকাম করিয়ে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করলেন। ব্রহ্মজ্ঞানলাভ এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য হলো। প্রতিমাসের প্রথম রবিবারের সন্ধ্যাবেলায় এই সভার অধিবেশনের সময় স্থির হলো। সভায় দেবেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেন যে এই সভার নাম হোক 'তত্ত্বরঞ্জিনী'। এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে রামচন্দ্র আহূত হন এবং সভার আচার্যপদে তাঁকে নিয়োগ করা হয়। তিনি এই সভার 'তত্ত্বরঞ্জিনী' নামের পরিবর্তে 'তত্ত্ববোধিনী' নাম রাখেন। এই ভাবে ১৭৬১ শকে ২১শে আশ্বিন রবিবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী তিথিতে এই তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হয়। সভার নাম পরিবর্তনের ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথের উপর রামচন্দ্রের ব্যাপক প্রভাবের পরিমাণ বুঝতে পারা যায়। বস্তুত এই প্রভাবের জন্যই দ্বারকানাথ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের উপর বিরক্ত হন এবং বলেন—আমি তো বিদ্যাবাগীশকে ভাল বলিয়া জানিতাম; কিন্তু এখন দেখি যে তিনি দেবেন্দ্রের কানে ব্রহ্মমন্ত্র দিয়া তাহাকে খারাপ করিতেছেন। একে তার বিষয়বুদ্ধি অল্প এখন সে ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া আর বিষয়কর্মে কিছুই মনোযোগ দেয় না।'

ব্রাহ্মসমাজের বিত্তস্থিতির দিকেও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল। দেবেন্দ্রনাথ যখন কয়েকজন ছাত্রকে বৃত্তি দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের কাজ শিখবার জন্য নিযুক্ত করেন, তখন রামচন্দ্র নিজের হাতে এঁদের ভার তুলে নেন এবং বেদপাঠ ও ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ দেবার জন্য তাঁদের বিত্তশুদ্ধভাবে তৈরী করেন।

এতসব করা সত্ত্বেও কিন্তু রামচন্দ্রের মন শান্তি পেল না। তাঁর মনে প্রথম থেকেই এই ভাবনা ছিল যে বিধিবৎ প্রতিজ্ঞার সঙ্গে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ না করলে সে ধর্মে স্থৈর্য হতে পারে না। রামমোহনের সহযোগীরূপে তিনি একবার এই কাজে উৎসাহী হয়েছিলেন, কিন্তু সে সময় অজ্ঞানের

প্রাবল্য ও দ্বেষের আধিক্য হেতু এ বিষয়ে কেউ সাহসী হননি। এখন দেবেন্দ্রনাথ তাঁর মনের মতো গড়ে উঠেছেন দেখে আপন মানস-ভাবনা সফল হবার সম্ভাবনায় উৎসাহিত হলেন। আর এই জন্যই 'বেদান্তশাস্ত্রের সারার্থানুসারে বিধিপূর্বক এই ব্রাহ্মধর্ম এদেশে প্রচার করিবার জন্য ১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষ বৃহস্পতিবার দিবা দুই প্রহর তিন ঘণ্টার সময়ে প্রথমতঃ একবিংশতি ব্যক্তিকে উক্ত ধর্মে প্রবিষ্ট করিলেন'। দেবেন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেছেন—সমাজের যে নিভৃত কুঠরীতে বেদপাঠ হইত, তাহা একটা যবনিকা দিয়া আবৃত করিলাম; বাহিরের লোক কেহ সেখানে না আসিতে পারে, এই প্রকার বিধান করিলাম। সেখানে একটি বেদী স্থাপিত হইল; সেই বেদীতে বিদ্যাবাগীশ আসন গ্রহণ করিলেন। আমরা সকলে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিলাম। আমাদের মনে এক নূতন উৎসাহ জন্মিল; অদ্য আমাদের প্রতি হৃদয়ে ব্রাহ্ম-ধর্ম-বীজরোপিত হইবে। আশা হইল, এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কালে ইহা অক্ষয়বৃক্ষ হইবে এবং যখন ইহা বলবান হইবে তখন ইহা হইতে আমরা নিশ্চয় অমৃতলাভ করিব।'

দেবেন্দ্রনাথ এরপর বিদ্যাবাগীশের সম্মুখে দাঁড়িয়ে একটি বক্তৃতা করেন। রামচন্দ্র এতে অত্যন্ত অভিভূত হন। তিনি বলেন—'রামমোহন রায়ের এই রূপ উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু তিনি তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এতদিন পরে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল।' ক্রমে দেবেন্দ্রনাথ সহ একুশজন প্রতিজ্ঞা পাঠ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। রামচন্দ্রের কাজ এতদিনে শেষ হলো। উত্তরসূরীর হাতে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মকে ন্যস্ত করে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। রামমোহন অল্পকালের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ নামে একটা প্রতিষ্ঠান করেছিলেন মাত্র কিন্তু সে প্রতিষ্ঠান যে ধর্মের ছায়া ছাড়া টিকতে পারে না সেটা উপলব্ধি করেই রামচন্দ্র ব্রহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের বিস্তার সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। কাজেই একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে, এককালে যে ব্রাহ্মধর্ম বাংলাদেশে প্রগতিশীল নবজাগরণের প্রেরণা রচনা করেছিল আসলে তা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা লালিত ও পরিপোষিত।

রামব্রহ্ম সান্যাল ও শতবর্ষ পূর্বের ব্যাঘ্র-বিবরণ

সন্তোষকুমার বসু

ভারতের বন্যপ্রাণী-বিজ্ঞান চর্চার ধারা যথেষ্ট পুরাতন। ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মুদ্রাঙ্কে, ভাস্কর্যে ও চিত্রকলায় সিংহের, বাঘের ও ব্যাঘ্রজাতীয় অন্যান্য প্রাণীর বহু চিত্রাঙ্কণে ও ঘনয়াতনের মাধ্যমে ভাস্কর্য রূপায়ণে ও খোদিত ভাস্কর্য অলঙ্করণে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

সংরক্ষিত বনাঞ্চল, অভয়ারণ্য, রাজকীয় পশুশালা এসব প্রতিষ্ঠানের কথা ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিবরণে আছে। কিন্তু আধুনিককালের সূচনাতে বন্যপ্রাণী চর্চার ধারা কতটা সাফল্যলাভ করেছিল তার পরিচয় মেলে নিম্নোক্ত বিবরণটিতে।

সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে একাধিক পশ্চিমগোলার্ধবাসী য়ুরোপীয় রাজপুরুষ, শাসক ও রাজ্যবিস্তারেরত দুঃসাহসী ব্যক্তি শত শত বন্যপ্রাণী শিকার করার ও নির্বিচারে হত্যা করার মধ্য দিয়ে আধুনিক প্রাণীবিজ্ঞানের বন্যপ্রাণীকূলে শ্রেণীবিভাজন ও বাসস্থল বিবরণ ও স্বভাবাদি নিয়ে যে বৈজ্ঞানিক চর্চা করা হয়েছে তার পরোক্ষ প্রেরণা ও উপকরণ সরবরাহ করেছিলেন। এঁদের অনেকের নাম আমাদের মুখে মুখে ফেরে।

কিন্তু কলিকাতার বাঙালী বন্যপ্রাণীবিদ্ শ্রদ্ধেয় রামব্রহ্ম সান্যাল মহাশয়ের বৈজ্ঞানিক অবদান আজও অনাদৃত হয়ে রয়েছে। আলিপুর পশু-উদ্যানের বা চিড়িয়াখানার এই প্রথম সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বা সংরক্ষণকারী অধ্যক্ষ একটি অত্যন্ত সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ পুস্তকে আবদ্ধাবস্থায় বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও পরিচর্যা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা দিয়ে ১৮৯২ সালে 'এ হ্যাণ্ড বুক ফর দি ম্যানেজমেণ্ট অব অ্যানিম্যালস্ ইন্ ক্যাপটিভিটি ইন্ লোয়ার বেঙ্গল' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকটিতে প্রথমে প্রাণীকুলের তৎকালীন শ্রেণীবিভাজন অনুসরণ করে লাতিন ভাষায় বৈজ্ঞানিক নামসহ সূচীপত্র রচিত করা হয়েছে। এর পরে দুইটি ভাগে রাখা হয়েছে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কথা ও পক্ষীকুলের বিবরণ। সাড়ে তিনশতাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে সমসাময়িককালের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথমে প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম তারপর হিন্দী ও বাংলায় স্থানীয় প্রচলিত নাম দেবার পর একে একে দেহাকার, প্রাকৃতিক বাসস্থলের পরিচয় ও বিবরণ, আবদ্ধাবস্থায় জীবৎকাল, সুস্থ প্রাণীর পরিচর্যা, বাসব্যবস্থা, খাদ্য, প্রজনন, পরিবহণ পদ্ধতি, অসুস্থাবস্থায় পরিচর্যা বিভিন্ন অসুখের বা রোগের নাম সহ প্রতিষেধক ব্যবস্থার কথা প্রভৃতি বলা হয়েছে। এই গ্রন্থে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রোগের কারণাদি নির্ণয়ের জন্য অসুস্থ প্রাণীর শবব্যবচ্ছেদের ফলাফলও গ্রথিত করে দেওয়া হয়েছে। লেখক বন্যপ্রাণীর স্বভাব ও আবদ্ধাবস্থায় আচরণকেও অবজ্ঞা করেন নি। নিখুঁত ও ক্ষেত্র বিশেষে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য বিবরণ দেওয়ার পর লেখক পশুশালার একাধিক ঘটনাকে তুলে ধরেছেন।

আমাদের দেশে বন্যপ্রাণী নিয়ে মুদ্রিত বইয়ের অভাব নেই। কিন্তু এধরণের বেশীর ভাগ বইয়ে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান-নির্ভর আলোচনার পরিবর্তে কল্পিত কাহিনীর আধিক্য পীড়াদায়ক। ঠিক এই রকম একলা অবস্থায় রামব্রহ্ম সান্যালের গ্রন্থটি এক অভূতপূর্ব ব্যতিক্রম।

আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে কেরী সাহেবের চিত্রিত কিশোরদের পাঠ্য পুস্তক 'পশ্বাবলী' প্রকাশিত হয়েছিল উনবিংশ শতকে প্রথমার্দ্ধে। কলিকাতার শহরাঞ্চলে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের চর্চার সূচনাও হয়েছিল ঐ শতাব্দীরই মধ্যভাগে। কাজেই আমাদের পক্ষে আনন্দ ও গর্বের কথা যে এসব ঘটনার মাত্র বছর পঁচিশ-ত্রিশ মধ্যেই বাঙালী চিকিৎসকেরা যে কৃতী বৈজ্ঞানিক ব্যবহার করেছিলেন তাই নয় উপরন্তু আমরা ঐ সময়ের মধ্যে রামব্রহ্ম সান্যালের এমন একটি গ্রন্থের সম্মুখীন হই যেটি তখনকার দিনে দেশে-বিদেশে সাড়া জাগিয়েছিল। এমন কি একজন বিখ্যাত বিদেশী জীববিজ্ঞানবিদ্ আক্ষেপ করেছিলেন ভারতীয় প্রাণীদের সম্পর্কে তাঁর সুবিখ্যাত পুস্তকটিতে তিনি শ্রদ্ধেয় রামব্রহ্ম সান্যাল মহাশয়ের অভিজ্ঞালব্ধ বিবরণের সাহায্য তিনি নিতে পারেননি। ইনি লণ্ডনের জুলজিকাল সোসাইটির সহ-সভাপতি ব্লানফোর্ড। অনুরূপ সম্বর্দ্ধনা এসেছিল আর একজন সহ-সভাপতি, এ্যাণ্ডারসনের নিকট থেকে। সমসাময়িক প্রখ্যাত বিজ্ঞানবিষয়ক পত্র পত্রিকা এটিকে পশুশালা সম্পর্কীয় রচনার মধ্যে অন্যতমরূপে অভিনন্দিত করেছিল।

আজ ভারতে বাঘের সংখ্যা কমে গেছে। প্রথম শ্রেণীর বন্যপ্রাণী সম্পদরূপে এদের কি করে রক্ষা করা যায় এ বিষয়ের আলোচনার অন্ত নেই। বাঘরক্ষার কেন্দ্র নিয়ে বহু তর্কবিতর্ক হচ্ছে। ঠিক এরকম একটা পরিবেশে আমরা রাম সান্যাল মহাশয়ের উপরিলিখিত পুস্তকের মধ্য থেকে কেবলমাত্র বাঘের বিবরণটির পরিচয় দেবার প্রচেষ্টা করেছি। বিস্তৃত উদ্ধৃতি ও আংশিকভাবে সংক্ষিপ্ত সারাংশকে একত্রে গ্রন্থণের মাধ্যমে। আশা করা অন্যায় হবে না যে এই বিবরণ আজকের বাঙালীর নিকট শিক্ষাপ্রদ ও কৌতূহলোদ্দীপক হবে।

বাঘ (৪৮) **[ফেলিস্ টাইগ্রিস-লিন] হিন্দী : শের, বাঘ ॥ বাংলা-বাঘ** ॥ 'বাঘের আকার ও বর্ণ যথেষ্ট বৈচিত্র্যময়। বাংলার সুন্দরবনের বাঘের গাত্রবর্ণ মধ্যভারত দক্ষিণ ভারতের বাঘের অপেক্ষা গাঢ়। আবার মালয়ের বাঘের গায়ের রঙ সুন্দরবনের বাঘের অপেক্ষা গাঢ়তর। কিছু বাঘের কান অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার এবং কানের পাশ্ববর্তী বাইরের শ্বেতবর্ণের ছোপ বা বর্ণলেপের আকার বৃহত্তর। কপালের ঈষৎস্ফীত গঠনানুসারে বাঘের মস্তকের আকারের ও পরিমাপের তারতম্য হয় এবং এই ভাবে বাঘের মুখাবয়ব কম কম বা বেশী লক্ষণীয় হয়ে ওঠে আর মাথার খুলির প্রশস্ততা বা সঙ্কীর্ণতা প্রকটিত হয়। বাঘিনী বাঘ হইতে কৃশতর ও আরও লম্বাটে ধরণের দেহগঠন বিশিষ্ট। সাধারণত পুরুষ বাঘের দেহের গঠন ভারী ধাঁচের।

বাসস্থল—কেবলমাত্র এশিয়া মহাদেশে বাঘ পাওয়া যায় এবং ভারতের সমস্ত অঞ্চলে, ব্রহ্মদেশে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায়, জাভা ও সুমাত্রায় এবং সমগ্র চীনদেশ এর মধ্যে পড়ে। মধ্য এশিয়ায় আমুর নদীর উপত্যকায়, পূর্ব তুর্কীস্তানের 'লবনর'-এর চারিপাশে এবং আলতাই পাহাড়ে এবং কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ তীরে বাঘ পাওয়া যায়। ভারতে বাঘ কেবলমাত্র সমভূমিতে আবদ্ধ নয়। হিমালয়ে বাঘ পাওয়া গেলেও সেটা বোধ হয় ৭০০০ হাজার ফুট হতে উচ্চতর অঞ্চল থেকে নয়। এই পশুশালায় সুন্দরবন, ঢাকা, মৈমনসিংহ, টিপেরা, রঙপুর, মালদহ, হাজারিবাগ, রাঁচি, সাঁওতাল পরগণা, গয়া, দ্বারভাঙ্গা, ডুমরাও, মির্জাপুর, এলাহাবাদ, বিজনৌর (উত্তর পশ্চিম প্রদেশ) ত্রিবাঙ্কুর (দক্ষিণ ভারত) গঞ্জাম (মাদ্রাজ), সুমাত্রা ও মলাক্কা এ সমস্ত স্থান থেকে বাঘ গ্রহণ করা হয়েছে।'

আবদ্ধাবস্থায় জীবৎকাল—এই পশুশালায় সর্বাধিক বেঁচে থাকা বাঘের জীবনকাল চতুর্দশ বছর। ১৮৭৮-এ প্রাপ্ত একজোড়া মানুষ-খেকো বাঘ এখনও বেঁচে আছে (১৮৯২) এবং বৃদ্ধ হলেও চমৎকার স্বাস্থ্যরক্ষা করছে।

সুস্থ অবস্থায় পরিচর্যা—যখন সমস্ত বৃহদাকার মাংসাশী পশুদের একই বাড়ির পাশাপাশি থাকা কক্ষাবলীতে রাখা হয় তখন বাঘের রক্ষণ ব্যবস্থা মোটামুটিভাবে সিংহের রক্ষণ ব্যবস্থার অনুরূপ। তবে পৃথক পৃথক সমস্যার সমাধানও পৃথকভাবেই করতে হয় ছোটখাট ব্যাপারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে নবগত বাঘ উৎপাতের কারণ হয়। কারণ তারা সকালবেলায় খাঁচার অভ্যন্তরস্থ কক্ষ থেকে বাইরে আসতে চায় না কাজেই তাদের খাঁচার ভিতরের দিকের বিশ্রামাগারটি পূর্ব-নির্দ্ধারিত সময়ে পরিষ্কার করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। রাত্রিবেলায় যখন নিঃশব্দে প্রাণীটি খাবার জন্য ভিতর থেকে খাঁচার বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে তখন তাকে রাত্রির জন্য বাইরের দিকেই আটকে রেখে এই সমস্যাকে অতিক্রম করা যেতে পারে। আলোচ্য প্রাণীটি হিংস্র না হয়ে কেবলমাত্র নিঃসঙ্গ হবার চেষ্টা করতে থাকলে একে এক বা দুই দিনের জন্য বাইরের দিকে রাখলেই যথেষ্ট। যতদিন না খাঁচা পরিষ্কার করা পরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু তিরিক্ষি ও বদ্‌মেজাজী বা হিংস্র বাঘের জন্য অন্য ব্যবস্থার দরকার। দিনের বেলায় বাইরে রাখলে দেখা যায় যে শেষোক্ত প্রাণীরা খাঁচার গরাদে এমন জোরে আছড়ে পড়ে যে তাদের কপালে আঘাতের দাগ হয় এবং কপাল আহত হয়।

খাদ্য—'খাদ্যের ব্যাপারে বাঘকে সিংহের মতই পরিচর্যা করা উচিত। অবশ্য বিশেষ বিশেষ প্রাণীর বিশিষ্ট পছন্দ অপছন্দ এবং মনোবিকারকে উপযুক্ত মূল্যদান করা কর্তব্য। এক সময়ে পশুশালার একটি বাঘিনীর গোমাংস গ্রহণের প্রবৃত্তি একটা অনতিক্রম্য আপত্তি ছিল। এই প্রবৃত্তি পূর্ব থেকে ছাগমাংস গ্রহণের অভ্যাসের ফল বলে মনে করা হয়। সমস্ত বড় মাংসাশীদের গ্রীষ্মকালে বিকালে ৫-৩০টা থেকে ৬টার মধ্যে ও শীতকালে ৪টা থেকে ৪-৩০ এর মধ্যে দৈনিক একবার খাদ্য প্রদান করা হয়। বাড়ন্ত অথবা অসুস্থ প্রাণীকেই কেবল দুইবার খাদ্য সরবরাহ করা হয়। সপ্তাহে সপ্তাহে একবার তাদের উপবাস করিয়ে রাখা হয় অথবা এবং অভিজ্ঞতার ফলে দেখা যায় যে এই পদ্ধতি প্রাণীদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। দেখা যায় যে কোন কোন সময়ে তারা স্বেচ্ছায় এতটুকুও কষ্ট না পেয়ে একদিক্রমে তিন-চারদিন পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণে বিরত থাকে। এই রকম ক্ষেত্রে তাদের খাদ্য গ্রহণের প্রবৃত্তিকে তীক্ষ্ণতর করার জন্য তাদের বরাদ্দ খাদ্যের পরিবর্তন করা প্রয়োজন। খাদ্য-পর্বেই মাংসাশী প্রাণীরা জলপান করে। এই জন্য তাদের খাঁচার ভিতরের দিকটায় সব সময়ে জলের ব্যবস্থা রাখা হয়। উত্তম ও পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণ এই প্রাণীরা বেশ খানিকটা পান করে একাধিকবার। কখনও কখনও তাদের খাদ্যে ও জলে 'ফ্লাওয়ার্স অব সালফার' দেওয়া হয়। অনেক সময়ে এদের খাবার জলের পাত্রে ঐ জিনিষটির এক টুকরো রাখা হয়। সালফার সকল আবদ্ধ প্রাণীর পক্ষে স্বাস্থ্যদায়ক সালসা স্বরূপ।'

'এখানে উল্লেখ করা যায় যে এই প্রাণীদের খাদ্য বিতরণের পাত্রটি এবং খাবার রাখবার কানাযুক্ত থালা প্রতিদিন সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা উচিত। এর অন্যথা হলে এগুলি যে কেবলমাত্র নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পড়ে তা নয় খাদ্যোপযোগী মাংসকেও দূষিত করে দেয়।

প্রজনন—'এই পশুশালায় কয়েকবার বাঘের প্রজনন হয়েছে। ১৮৮০ সালের মে মাসে ১৮৭৮ যে প্রাপ্ত মানুষ-খেকো বাঘের মধ্যে স্ত্রী বাঘটি তিনটি শাবকের জন্ম দেয়। প্রথম দুটি শাবক অর্ধঘণ্টার ব্যবধানে প্রসব হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শাবকের প্রসবকালের ব্যবধান ছিল দেড় ঘণ্টার মত। এই সময়ে কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এমন কি অতি সাধারণভাবে পুরুষ বাঘটিকে সরিয়ে নেওয়া হয়নি। এই কাজটি পরে অবশ্য তাড়াতাড়ি করে ফেলা হয় এবং তাই করাই উচিত। কারণ বাঘজাতির স্তন্যপায়ীদের পুরুষেরা নবপ্রসবিত শাবক কোন কোন ক্ষেত্রে খেয়ে ফেলার একটা নিশ্চিত প্রবণতা রাখে। বাঘিনী স্বাভাবিকভাবেই বদ্‌মেজাজী হলে একেবারে নির্জনতা ও একে একাকীত্ব দানের জন্য খাঁচা সামনে ও পিছনে ঢেকে দেওয়া হয়। আর দর্মার পর্দা দিয়ে খাঁচার সামনে লৌহজালিকা ঢাকা হয়। বাঘিনীকে বিরক্ত না করার জন্য খাঁচা পরিষ্কার করার কাজ কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখা হয় কেবল পড়ে থাকা খাবার ও অন্যান্য আবর্জনা মাঝে মাঝে বাইরে থেকে সাবধানে সরিয়ে নেওয়া হয়।'

প্রায় তিন সপ্তাহের মধ্যে নবজাতক ব্যাঘ্রশাবকেরা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে সুরু করে। এই কারণে এই সময়ে অপসারিত দর্মার পর্দাকে অন্ততঃ খাঁচার সামনে কিছুটা উচ্চতা পর্যন্ত ঢেকে রাখার জন্য ব্যবহার করতে হয় শাবকগুলিকে খাঁচার গরাদের বাইরে উল্‌টে পড়ার হাত থেকে রক্ষার জন্য। তৃতীয় শাবকটি জন্ম থেকে দুর্বল স্বাস্থ্য ছিল এবং একমাস বয়সে মারা যায়। বাকি দুটি শাবক ভাল ভাবেই বেড়ে ওঠে ও সতর্ক রক্ষণাবেক্ষণের সাহায্যে। চারমাস বয়সকালে এদের মায়ের কাছ থেকে আলাদা করে রাখা হয় এবং এই সময় থেকে প্রায় তিন মাস কাল তাদের প্রধানতঃ জীবন্ত খাবার খাইয়ে রাখা হতে থাকে। এই যথাযোগ্য খাদ্য ব্যবস্থার জন্য তাদের স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠা সম্ভব হয়।

১৮৮৬-র মে মাসে একটি অল্পবয়সী বাঘিনীর শাবকদ্বয় দুর্ভাগ্যক্রমে কেবলমাত্র ছয়দিন বেঁচেছিল। ১৮৮৯-র এপ্রিলে ঐ বাঘিনীটিই আবার দুটি বাচ্চা প্রসব করে এবং এ দুটি অত্যুত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল। এই শাবক দুটিকে ১৮৮০-র শাবকদের চাইতে বেশী সময় তাদের মায়ের নিকট থাকতে দেওয়া হয়েছিল। বাচ্চাদের বেড়ে ওঠার বিভিন্ন পর্যায়ে আপনার শাবকদের প্রতি বাঘিনীর ব্যবহার পর্যবেক্ষণের পক্ষে কৌতূহলজনক। যখন শাবকেরা তিনমাস বয়স্ক তখন তাদের কম পরিমাণ টাট্‌কা মাংস খাবার শিশুসুলভ প্রচেষ্টার প্রতি মায়ের যথেষ্ট মনযোগ সহকারে দেখাশুনা করবার প্রবৃত্তি লক্ষণীয়। কিন্তু এর পরে শীঘ্রই বাঘিনীর শাবকদের প্রতি আচরণ পরিবর্তিত হয় কাজেই বাচ্চারা পাঁচ বা ছয় মাসের হলে বাঘিনী খাওয়ানোর সময়ে শাবকদের সঙ্গে বিবাদ করতো যতক্ষণ না এমন অবস্থা হল যে স্থায়ীভাবে তাদের আলাদা করে রাখতে হল। এই বাঘিনীটি অত্যন্ত বেশী রাগী প্রকৃতির ছিল। তাকে দর্মার পর্দার আড়ালে প্রায় পাঁচ মাস রাখতে হয়েছিল। এই সময়ে দেখা যায় যে বাঘিনীর গর্ভধারণের কাল ১০৬ দিনের।

স্থানান্তর—'সিংহের ক্ষেত্রে স্থানান্তর করার যে সব বক্তব্য ছিল সেসব বাঘের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। কয়েকবার পশুশালায় চমৎকার এক বাঘ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল। হয় তাদের একটি দাঁত ভেঙ্গে গেছল অথবা এর গায়ে আঘাতজনিত ক্ষত দেখা গেছল। একটি বড় বাঘের স্বদন্ত এর কারণ পরীক্ষা করে দেখা গেল যে কাঠের বাটাম বা পাত দিয়ে বাক্সের চারিদিকে

যে জড়াবার যোগ্য লোহার পাত বা বন্ধনী দিয়ে ভিতরের দিকে বাঁধা থাকে সেটা ছিঁড়ে টুকরো হয়ে গেছল আর একটি কোণায় থাকা দণ্ডের এবং এক টুকরো লৌহবন্ধনীর মধ্যে ভাঙ্গা দাঁতটি একটি কীলকের মত তখনও আটকে আছে একটা বেরিয়ে আসা পেরেকের সাহায্যে। এরকম একটা ঘটনা থেকে বোঝা যায় পশুকে যাত্রাপথে প্রেরণ করার পূর্বে খাঁচার মধ্যেটা পেরেক থাকা অন্য খোঁচা ইত্যাদি থেকে মুক্ত কিনা এটা দেখে নেওয়া কতটা দরকার কারণ এরকম জিনিষ জীবনহানি বা অঙ্গহানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে ভ্রাম্যমান খাঁচায় পশু পাঠানোই স্থানান্তরণের পক্ষে সব চেয়ে ভাল পন্থা।

অসুস্থাবস্থায় পরিচর্যা—'বাঘেরা দেখা গেছে বাত, চর্বিজমে অসুস্থতা, আন্ত্রিক কৃমি জীবাণু, টিউমার, নখের বাড়ের ফলে থাবার তলায় ঢুকে যাওয়া, এপিলেপসি বা সন্ন্যাসরোগ অথবা মৃগীরোগ আরও অনেক প্রকার জটিল রোগে ভোগে। হয়ত বাসগৃহের সিমেন্টের মেঝেতে একনাগাড়ে শুয়ে থাকলে পরে বাঘের বাতরোগ হয়। এটি অবশ্য প্রতিটি আবদ্ধ প্রাণীর জন্য একটি করে বেদীর সহজ পরিকল্পনার দ্বারা একেবারে কমিয়ে আনা যায়। কোন বন্যপ্রাণীকে অবশ্য বেদীর ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে সেটি ব্যবহার করানো প্রায় অসম্ভব। এবং অনেক অবাধ্য ও মূর্খ প্রাণী মাটিতে শুয়ে থাকা ছাড়ে না।

কখনও কখনও 'অ্যাডিপোসিটি' বাঘের পক্ষে প্রাণান্তকর। ১৮৮৫র অক্টোবরে একটি প্রায় পূর্ণবয়স্ক বাঘ হঠাৎ মারা যায়। মৃত্যুর পরবর্তীকার ব্যবচ্ছেদে দেখা যায় যে তার দেহাভ্যন্তরের নাড়িভূড়ি বাড়তি চর্বির গাদায় বসানো আছে। কোন সন্দেহ নেই যে অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ ও শরীরচালনার অভাবই এরকমটা হওয়ার কারণ।

অনেকসময়ে বাঘের নখ বড় হয়ে উঠে থাবার মাংসে বসে যায়। এটি বড় বেদনাদায়ক যদি এটি যথাসময়ে কেটে ফেলে বাদ না দেওয়া হয়। একটি বয়স্ক মানুষখেকো বাঘের এ অবস্থা হয়েছিল। যার ফলে বাঘটি কিছুদিনের জন্য খোঁড়া ও কৃপাযোগ্য হয়ে পড়ে। এর নখগুলি কাটবার জন্য একটা বিশেষ খাঁচা তৈয়ারী করা হয়। খাঁচাটিতে বাঘকে কম জায়গায় ঠেসে ধরার মত একটি কাঠামোর ব্যবস্থা ছিল। এর পরে নখ কেটে দেওয়া হয় ও ক্ষতস্থান ধুয়ে দেওয়া হয়। প্রায় দশদিনের মধ্যে প্রাণীটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রত্যেক খাঁচার মধ্যে একটি করে কাঠের গুড়ি দিয়ে দিলে প্রাণীটি যখন ইচ্ছা তখন এটি আঁচড়ে নখের থাবার মধ্যে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত করে।

নানারকমের পোকা বা জীবাণু অনেক সময়ে এইসব প্রাণীদের পক্ষে কষ্টকর সমস্যাদির সৃষ্টি করে। এরকমটা দেখা গেলে বা সন্দেহ হলে এক বা দুই দফা 'স্যানটোনাইন' (৪ থেকে ৫ গ্রাম) ফলপ্রদ হবে। 'স্যানটোনাইন' দেবার সহজতম পদ্ধতি হল যে এর চেয়ে দ্বিগুণ বা তিন গুণ ওজনের ফ্লাওয়ার্স অব সালফার' এর সঙ্গে মিশ্রিত করে একখণ্ড ছোট মাংসের টুকরোয় লুকিয়ে রেখে প্রাণীটি ক্ষুধার্ত থাকার সময়ে দিতে হবে। উপবাসের জন্য নির্দিষ্ট দিনেই এটি প্রয়োগ করা ভাল কারণ 'স্যানটোনাইন' দেবার পূর্বে অথবা পরে দশ বারো ঘণ্টা প্রাণীটির কোনও খাদ্য পাওয়া উচিত নয়।

বাঘেদের সময়ে সময়ে 'টিউমার' থেকে বা দেহের সংযোগস্থলের স্ফীতি থেকে কষ্ট পেতে দেখা

যায়। কিন্তু এইপ্রকারে বর্ধিতাংশের প্রকৃতি কখনও ধরা যায়নি।

শবব্যবচ্ছেদমূলক পরীক্ষার নিম্নলিখিত ফলাফল থেকে ১৮৭৮ সালের নভেম্বরে কোনও ধারাবাহিক অসুস্থতার কারণে মৃত বাঘিনীর দেখা গেছে যে এই সমস্ত আবদ্ধ করে রাখা প্রাণীরা অনেক সময়েই নানারকম জটিল রোগের ফলে মৃত্যুমুখে যায়। এ সম্পর্কিত প্রতিবেদনটিতে আছে হৃদপিণ্ড ও ফুসফুস স্বাস্থ্যময়, পাকস্থলী সামান্য পুঞ্জিত পদার্থপূর্ণ গলব্লাডার বা পিত্তাশয় পিত্তরসপূর্ণ এবং যকৃৎ পথ শেষ দিকটা প্রতিবন্ধক সূচক। অন্ত্রে মলনালী হতে তিন ইঞ্চি উপরে একটা সঙ্কুচিত ভাব। আবার এই সঙ্কোচনের দেড় ইঞ্চি উপরে অন্ত্রের শ্লেষ্মাচ্ছাদন একটা স্থূল হয়ে গেছে এটা দেখা যাচ্ছিল। এটি উন্মুক্ত করতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাড়ের টুকরো দেখা গেল যেগুলো পচনের বিভিন্নস্তরে উপনীত হয়ে একটা ক্ষতস্থলে প্রভাববিস্তার করে অবস্থিত ছিল। কিড্‌নি বা বৃক্কসমূহ অস্বাভাবিক বৃহদাকার এবং মূত্রগ্রন্থির বহিরাংশ স্পর্শমাত্রে খুলে আসছে। এগুলি লম্বালম্বিভাবে খুলে ফেললে পরে এখানে ওখানে শক্ত দানাদার জমে যাওয়া পদার্থ দেখা গেল উপরের আবরণের নানা স্থানে। ডান দিকের মূত্রনালী বা গবিণী মূত্রাশয় হতে এক চতুর্থাংশ ইঞ্চি নিম্নেও জমে যাওয়া পদার্থ পাওয়া গেছল।'

একটি যৌবনোন্মুখ বয়সের বাঘিনী পরের দিকে এক ধরণের 'ফিট' হয়ে পড়লো। এই রোগ প্রত্যেক দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে দেখা যেত। কখনও বা এর বেশী ঘন ঘন এই রোগ হোত। ঐক্ষণে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পক্ষাঘাত গ্রস্তের মতো হয়ে যেত এবং সমস্ত দেহে খেঁচুনি দেখা দিতো। এই রোগের প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়নি। (ঐ পশুটি পরে মারা গেলে শবব্যবচ্ছেদ মুলক পরীক্ষা করে তার পাকস্থলী ও অন্ত্রে এক প্রকারের ক্ষুদ্র গোলাকার কৃমিতে ভর্তি দেখা গিয়েছিল)।

কয়েকবার পশু উদ্যানের বাঘের মধ্যে ভয়ঙ্কর আঘাতজনিত ক্ষতাদি হয়েছিল কিন্তু সতর্ক পরিচর্যায় এর প্রায় সবগুলিই নিরাময় হয়। এদের আঘাতের পরিচর্যার সাধারণ নিয়ম রূপে যাতে তাদের এসমস্ত ক্ষতাদি মাছি প্রভৃতির দ্বারা বেড়ে না ওঠে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে 'কোরোসিভ্ সাব্ লিমিটে'র কমজোরী মিশ্রণ ১৫০০ অথবা ১০০০ ভাগে ১ ভাগ পরিমাণ) উদ্যানের পিচকারী দিয়ে ক্ষতস্থলে নিরবচ্ছিন্নভাবে দেওয়া হত। রোগী যেখানে পোষমানা অথবা কমবয়সের সেখানে তাকে বার করে (ছোট) খাঁচায় রেখে ক্ষত দানা বেঁধে না ওঠা পর্যন্ত আঘাতস্থল পরিষ্কার করে ওষুধ লাগান হত দিনের মধ্যে একাধিকবার।

বাঘেদের স্বভাবের পর্যবেক্ষণ : বাইরের আকারের মত বাঘের মেজাজ ও স্বভাবেরও যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। কয়েকটি প্রাণী অপেক্ষাকৃত ভাল মেজাজের হয়। অন্যরা হয় গোমড়া ও রাগী প্রকৃতির। আবদ্ধাবস্থায় বর্ধিত প্রাণীরা একটু নরমভাবের এবং সময়ে সময়ে তাদের রক্ষকদের ও অন্যান্যদের নিজেদের ছোঁয়াছুয়ি করতে দেবার মত পোষমানা হয়। কিন্তু তাদের মেজাজ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা যায় না। বাঘেদের একটা লক্ষণীয় বিশেষত্ব যে এমনকি সবচেয়ে পোষমানা বাঘও খাবার দেবার সময়ে বন্য হয়ে ওঠে। অন্যদিকে একটি উদাহরণ আছে যেখানে একটি বাঘিনী মুখের খাবার ফেলে দিয়ে আদর আদায় করার জন্য ও দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তাড়াতাড়ি চলে আসতো প্রত্যেক সকালবেলায় যখন এরকম ব্যবহার পেতে সে অভ্যস্থ ছিল। চিড়িয়াখানায় প্রদর্শনের জন্য নির্ধারিত প্রদর্শনযোগ্য প্রাণীরূপে যেসব বাঘেরা লাজুক নয় এবং দর্শক বা আগন্তুকদের

খাঁচার নিকটে দাঁড়িয়ে থাকাতে আপত্তি করেনা তারা সর্বদাই নতুন ধরে আনা বন্য ও ভীত, সুবিধাজনকভাবে দেখার পক্ষে প্রতিকূল স্বভাবের নতুন ধরে আনা পশুদের চাইতে মূল্যবান। কতকসংখ্যক বাঘ তাদের পরিবর্তিত অবস্থায় অভ্যস্থ হতে অনেক সময় নেয়। অন্যরা কখনই আবদ্ধাবস্থায় অভ্যস্থ হয় না। রাঁচি থেকে আনীত দুটি বাঘিনীর মধ্যে একটি বাঘিনী সোজাসুজি নিজেকে না খেয়ে মেরে ফেলে যদিও তাকে খাদ্য গ্রহণ করে নতুন আবাসস্থলকে মেনে নেওয়ানোর সবরকমের প্রচেষ্টাই করা হয়েছিল। এই ব্যাঘ্রীর সাথীটি প্রথমে তার মত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেও এবং তার জীবনের জন্য ক্ষীণ আশা রাখলেও শেষকালে দৈনিক জীবন্ত ছাগশাবক ও মোরগের লোভের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল। আপাত দৃষ্টি অনেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনাও অন্যান্যদিক থেকে পোষমানা বাঘকেও ভয় পাইয়ে দেয়। পশুশালায় একটি সম্পূর্ণ পোষা অল্পবয়সী বাঘের স্বভাবছিল সকাল বেলায় তার খাঁচার বাইরের দিকের ভিজা মাটিতে শুয়ে থাকার। এটি দেখে খাঁচার ভিতরের মত বাইরেও একটি কাঠের পাটাতন-বেদী দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। যদিও নতুন বেদীটিতে কোনরকম লক্ষণীয় বিশেষত্ব ছিলনা কারণ এটিকে আকার ও গঠনের দিক দিয়ে বাঘটি রাত্রে যে বেদীটিতে নিদ্রায় অভ্যস্থ ছিল তারই মত করে নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু এই নতুন বেদীটির দর্শন লাভ করেই বাঘটিকে মনে হল যে সে যেন ভয় পেয়ে তার সমস্ত মানসিক ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। আর প্রভূত উত্তেজনার সঙ্গে খাঁচার চারিদিকে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বাঘটি দ্রুতগতি দৌড়ে ভিতরের ঘরে ঢুকে পড়লো এবং বেশ কয়েকদিন একেবারে বাইরে এল না। বেদীটি সরিয়ে দিলে বাঘটি আবার শান্ত হয়ে পড়লো।

বাঘেরা প্রায়ই তাদের বাইরের খাঁচার গরাদের ফাঁক দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে। অনেকসময়েই ফলাফল হয় গুরুতর। এরজন্য ফাঁক থাকা ব্যবধান মেঝে থেকে সাড়ে তিনফুট উচ্চ পাটাতন মেরে ঢেকে দেওয়া হত। এই পদ্ধতি অবশ্য তাদের প্রকৃতিকে দমন করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। যুদ্ধ করতে মনস্থির করে নিয়ে বাঘেরা হয় তাদের পিছনের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে অথবা কখনও কখনও গরাদের পাঁচিলে লাফ দিয়ে উঠে উপরের গরাদের মধ্যে দিয়ে থাবা গলিয়ে পরস্পরকে থামচাতো আর মাঝামাঝি থাকা আড়ের লোহার চ্যাপ্টা পাতের সঙ্কীর্ণ ধারে তারা খানিকক্ষণের জন্যে একটা দেহভার রক্ষণীর স্থান পেত। এই জন্যেই দেখা গেল যে খাঁচার উপরের দিক পর্যন্তই পাটাতনের ব্যবস্থা করলেই ভাল। বাঘেরা সিংহদের অপেক্ষা কম শব্দকারী প্রাণী। তাদের ভিতর থেকে উঠে আসা একটানের হুঙ্কার সাধারণতঃ সন্ধ্যাবেলায় শোনা যায়।'

এর পরে লেখক একটি বাড়তি অনুচ্ছেদে আলীপুর পশুশালা থেকে দুটি বাঘের পালানোর ঘটনা বিবৃত করেছেন। ১৮৭৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী সন্ধ্যে ছয়টায় 'বর্ধমান হাউস' থেকে, খাঁচার উপরে রক্ষকরা মাঝের প্রতিবন্ধক উঠিয়ে বাঘেদের ভিতরে ঢোকানোর সময় পলায়নপর বাঘেদের সর্ব প্রথম দেখতে পায়। ঠিক করা হয় যে বাঘদুটিকে পশুশালার মধ্যেই রাত্রিরমত আটকে রাখতে হবে এবং এইজন্য পশুশালার ভিতরের পথের আলো জালিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই বাঘ পালানো খবর ছড়িয়ে পড়লে পশুশালার দোকান-বাজার বন্ধ হয়ে চারিদিক নির্জন হয়ে পড়ে। এরপরে কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের অনুরোধে একদল সিপাই

পশুশালার চারিদিক ঘিরে থেকে সারারাত চেঁচাতে থাকে। বাঘ বাগানের বাইরে যায়না এবং যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্বেও পশুশালার কোন প্রাণীকে আক্রমণ বা আহত করে না। হয়ত ছাড়াপাবার আগেই খেয়েছিল বা তাদের নতুন পরিস্থিতিতে আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়ে তাদের এরকম নির্দোষ আচরণ হয়েছিল। এখানে আবার একটু উদ্ধৃতি দেবার লোভ সামলানো গেল না। রামব্রহ্ম লিখছেন 'তাদের ঘোরাঘুরির পথে একটি বাঘ দুইবার পশুশালার সুপারিন্টেণ্টডেণ্টের খুব কাছ দিয়ে চলে গিয়েছিল যিনি নিজেই তখন কেবল দর্মার মাদুরে ঘেরা ছোট্ট টিকিট ঘরে বসেছিলেন তখনও কোন প্রবেশদ্বারের নিকটস্থ বাড়ি তৈরী হয়নি। ঐ পশুদের গমনাগমনের খবর রাখবার জন্য 'বর্ধমান হাউসে'র উপরে থাকা দুই রক্ষকের সাহায্যে।' এর পরের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে পুলিশ কমিশনারের আগ্রহে তিনবার বন্দুকদেগে ভোর পাঁচটায় বাঘদুটি মেরে ফেলা হয়। এখানে সান্যাল মহাশয়ের আক্ষেপটি লক্ষ্য করার মত। তিনি একেবারে শেষপর্যন্ত বাঘদুটিকে জীবন্ত ধরার পক্ষপাতী ছিলেন। সখেদে লিখেছেন তিনি 'এটিই কলিকাতার এত কাছাকাছি গুলি করে বাঘ মারার একমাত্র নথিবদ্ধ ঘটনা হয়ে রইল' পরে খোঁজ নিয়ে দেখা যায় অসমাপ্ত 'বর্ধমান হাউসে' ভিতরে কর্মরত রাজমিস্ত্রীরা সন্ধ্যায় কাজ শেষ করে বেরোবার সময়ে পিছনের দরজা খোলা রেখে যায়। অনভিজ্ঞ রক্ষকেরা খাঁচার উপরে উঠে মাঝখানের লোহার কাঠামো তুলে বাঘ ভিতরে ঢুকবার চেষ্টা করতেই বাঘেরা আর কিছু করার না পেয়ে খোলা দরজা দিয়ে খাঁচার বাইরে এসে পড়েছিল। চন্দ্রালোকিত সেই রাতে ছাড়া বাঘের অপেক্ষারত রামব্রহ্ম যেন এখানে আমাদের শ্রদ্ধা কেড়ে নেন।

শ্রদ্ধেয় রামব্রহ্ম সান্যালের বিবরণের মধ্যে একটা সাহসীও কর্মক্ষম, কঠোর নিয়মানুগ এবং সাদামাটা দায়িত্বশীলতার ও সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষক সুলভ যে ব্যক্তিত্বের ছাপ ফুটে উঠেছে সেটি আজকের দিনে সুদর্লভ। এঁর লেখা পুস্তকটিতে বড় বাঘ ছাড়াও কেঁদুয়া বাঘ বা চিতাবাঘ, নানারকমের প্যান্থার বা লেপার্ড ও বন বিড়ালের অনুরূপ পর্যায়ক্রমযুক্ত বিবরণ রয়েছে। এঁর পুস্তকের সিংহবিষয়ক বিশেষ প্রবন্ধটিও বড় পরিসরের। রামব্রহ্মের বিবরণ থেকে এখনকারদিনে বাঘ যে ভারতের কতখানি বিস্তৃত অঞ্চলে পাওয়া যায় তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

আজকের দিনে হয়ত পশুজগতের জাতি-প্রজাতি নির্ণয়ের ও বৈজ্ঞানিক নামকরণের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পশুশালার কর্মপদ্ধতিরও পরিবর্তন হতে চলেছে। বাঘ সিংহকে আমরা আজ চিড়িয়াখানায় বাঘ পরিখায় ঘেরা স্বাভাবিক পরিবেশের অনুসরণে তৈরী রক্ষণাগারে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এতসব স্বত্ত্বেও প্রায় শতবর্ষ পূর্বের আধুনিক যুগের ভারতীয়দিগের মধ্যে পথিকৃৎ পশুশালা সংরক্ষক শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম সান্যাল-এর অবদান কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কলিকাতার আলিপুরস্থ পশুশালার বর্তমান শতবার্ষিকী বৎসরটিতে এই কথাই বিভিন্ন দিক থেকে বিচারসহ মূল্যায়নের মাধ্যমে বারম্বার স্মরণ করার যোগ্য।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাজেয়াপ্ত গ্রন্থাবলী

সোমেন্দ্রনাথ বসু

ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে সৌম্যেন্দ্রনাথ একটি বহুবন্দিত ও বহুনিন্দিত নাম। তাঁর ভক্ত অনুরাগী যত ছিল বিরুদ্ধবাদীর সংখ্যা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। কুৎসিত মিথ্যা রটনার জোয়ার বইয়ে দিয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে, ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়েও টানাটানি কম হয়নি। কারণ ছিল এই যে ভারতবর্ষের যখন কমিউনিষ্ট আন্দোলন বোঝাতেই ষ্টালিনের দেবত্ব ঘোষণা বোঝাতো তখন তিনিই একমাত্র নেতা যিনি উচ্চশিরে শত্রুপক্ষের কোন তোয়াক্কা না করে ষ্টালিন শাসনের সর্বপ্রকার দুর্নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। যে সময়ে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ায় ছিলেন তখন ক্ষমতা ধীরে ধীরে লেনিনের সহকর্মীদের মুঠো পরিচালনা থেকে চলে যাচ্ছে ষ্টালিনের হাতে। তখন রাশিয়ার সেরা তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন বুখারিন; তাঁর কাছে মার্ক্সবাদের পাঠ নিয়েছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ। ফলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এমন অনেক কিছু জানতেন যা ভারতের অন্যান্য কমিউনিষ্ট নেতাদের জানা সম্ভব ছিল না। পরে অবশ্য দেখা গেল যে তাঁর সমালোচনা ঠিকই হয়েছিল; যে সব সমালোচনার জন্য তিনি নিন্দিত সেই সব সমালোচনাই সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে প্রচারিত হল।

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামে তাঁর ষ্টালিনাশ্রিত শত্রুপক্ষ তাঁকে 'দালাল' বলে প্রমাণ করবার অনেক চেষ্টা করেছে। মুজফ্‌ফর আহমেদ তো এমন কথাও বলেছেন যে ১৯২৮ সালে রাশিয়া থেকে ভারতবর্ষে যে সৌম্যেন্দ্রনাথ ফিরে আসেন নি তার কারণ, "ভারতের তীব্র মজুর সংগ্রামের খবরে তিনি ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি ভারতে ফিরে আসেন নি"। এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করলুম এই জন্যে যে এ প্রবন্ধে দেখাতে চাই ইংরাজ গোয়েন্দা পুলিশ সৌম্যেন্দ্রনাথকে কি চোখে দেখতো। আজ ঘটনাস্থল থেকে কালের বিচারে অনেক দূরে সরে এসেছি আমরা। অকারণ উত্তেজনার কোন অবকাশ নেই। শান্ত বিচারে দেখা যাবে যে ভারত সরকার যে কমিউনিষ্টকে বারবার চিহ্নিত করে নানারকম সতর্কতা অবলম্বন করছে তাকেই শুধু দলীয় প্রচারের খাতিরে স্বয়ং মজফ্‌ফর আহমেদের মতো ভারী নেতাও কত মিথ্যা অপবাদে নিন্দিত করেছেন।

জামাণীতে থাকার সময়েই সৌম্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশিত করেছিলেন বাংলাতেই। সে পুস্তিকাগুলি ইংরাজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। পরে ১৯৩৪ সালে দেশে ফিরে আসার পরও তাঁর কিছু বই বাজেয়াপ্ত হয় এবং আর কিছু বই বাজেয়াপ্ত হবার প্রস্তাব সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আইনের ফাঁকে রক্ষা পেয়ে যায়। কোন এক সময়ে সরকারী মহলে এ প্রস্তাবও হয় যে সৌম্যেন্দ্রনাথের নামে যে কোন বই প্রকাশিত হবে সবই বাজেয়াপ্ত করা হোক। কমিউনিষ্ট নেতাদের মধ্যে মানবেন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাজেয়াপ্ত গ্রন্থের সংখ্যা সৌম্যেন্দ্রনাথেরই সবচেয়ে বেশি—ইংরাজ সরকার তাঁকে এবং তাঁর রচনাকে ভয় পেয়েই এ কাজ করেছিল সরকারী ফাইলেই তার প্রচুর প্রমাণ আছে। মুজফ্‌ফর আহমেদের ইতিহাসে এসব ঘটনার কোন উল্লেখ নেই কারণ তাহলে সৌম্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে ধারণা তিনি পাঠকদের দিতে চেয়েছেন তা মিথ্যা হয় না।

বাজেয়াপ্ত গ্রন্থের যে তালিকা আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে তাতে ভারতবর্ষে ফেরার আগে অর্থাৎ ১৯৩৪ সালের আগে সৌম্যেন্দ্রনাথের তিনটি বই বাজেয়াপ্ত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। তিনটি বই ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের বিজপ্তি বলে বাজেয়াপ্ত হয়। সেই বই তিনটি হল 'বিপ্লব বৈশাখী', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'লাল নিশান'। তিনটি বই বাজেয়াপ্ত হবার তারিখ যথাক্রমে ৬ই ডিসেম্বর ১৯৩০, ২১শে মার্চ ১৯৩১, ৫ই মার্চ ১৯৩২। প্রথম দুটি গ্রন্থের পশ্চাৎপট আমাদের জানা নেই। তৃতীয় গ্রন্থটি 'লাল নিশান' যখন ভারতবর্ষে এসে পৌঁছলো তখন বাংলার গোয়েন্দা পুলিশ বাংলার সরকারকে অনুরোধ করলো ঐ গ্রন্থের ব্যাপারে ভারত সরকারের পরামর্শ নিতে। ভারত সরকারের একটি ফাইলে (হোম ডিপার্টমেন্ট ফাইল ২৯।১।৩২ পল) ঐ বিষয়ে নেপথ্য কাহিনী কিছু জানা গেল।

গোয়েন্দা বিভাগের ইনটেলিজেন্স ব্যুরো সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানালো,—'বিগত চৌদ্দ মাসে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিম্নলিখিত দুটি গ্রন্থ সীকাইমস অ্যাক্টের দ্বারা শাসিত হয়েছে:

(এ) 'বিপ্লবী বৈশাখী (ষ্টর্‌ম্ অফ রেভোলিউশন) বাংলায় লেখা (ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট, সেন্ট্রাল রেভিনিউ নোটিফিকেশন নং – ৪২ কাষ্টমস, তারিখ ৬, ১২, ৩০)

(বি) 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ (লং লিভ্ রিভলিউশন)—বাংলায় লেখা পুস্তিকা (ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট, সেন্ট্রাল রেভিনিউ নোটিফিকেশন নং ১৪ তারিখ ২১. ৩. ৩১)'

ঐ ইনটেলিজেন্স ব্যুরো আরও লিখছেন:—'আমরা জানি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাশিয়া সম্বন্ধে আরও দুটি বই লিখেছেন। একটি হলো Weed Burners যার জন্য কোন প্রকাশক তিনি এখনো খুঁজে পাননি। অক্সফোর্ড ইণ্ডিয়ান মজলিসের পত্রিকা 'ভারতে' এর কয়েকটি অধ্যায় ছাপা হয়েছে। সে অধ্যায়গুলি খুবই আপত্তিকর এবং বইটি ছাপা হয়ে ভারতবর্ষে এলে প্রবেশ রোধ করা উচিত। দ্বিতীয় বইটি হলো বিপ্লবী রুশিয়া—এটি প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতায়। এতে আপত্তিকর বিশেষ কিছু নেই তবে রাশিয়া সম্বন্ধে লোকের শ্রদ্ধা বাড়াবার চেষ্টা আছে।

'আমরা সম্প্রতি জেনেছি যে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা দুটি বিপ্লবী পুস্তিকা বার্লিনে লিথোগ্রাফে ছাপা হয়ে ভারতবর্ষে পাঠানো হয়েছে। ডি. আই. বি. এই অভিমত পোষণ করেন যে এমন একটি আদেশ প্রচার করা হোক যাতে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা যে কোন গ্রন্থ, যে কোন ভাষার বা তার বিশেষরকমের উদ্ধৃতি সম্বলিত অন্য কোন গ্রন্থ ভারতে প্রবেশ করতে না পারে। (৫৮১ নং, ৭ই জুলাই ১৯২৩ তারিখের ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের আদেশবলে এম. এন. রায় ও এভেলিন রায়ের সমস্ত গ্রন্থ ভারতে প্রবেশ না করার নির্দেশ বলবৎ আছে)। সুতরাং ফিনান্স ডিপার্টমেন্টকে সী কাষ্টম্‌স্ অ্যাক্টে একটি ব্যাপক আদেশ জারী করতে অনুরোধ করা হোক।'

পলিটিকাল সেকশন ঐ মন্তব্য সমর্থন করে ২৬. ২. ৩২ তারিখে লিখলেন, 'মি টেগোরের অধিকাংশ গ্রন্থই আপত্তিজনক এবং মনে হয় ডি. আই. বি. প্রস্তাব গ্রহণ করাই উচিত।'

এইসব সিদ্ধান্তের পর ৫ই মার্চে (১৯৩২) ২নং কাষ্টম্‌স্ নোটিফিকেশনে 'লাল নিশান' গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়।

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ সালে বাংলা সরকারের এডিশনাল ডেপুটি সেক্রেটারী, ভারত সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তাও এখানে তুলে দেওয়া গেল।

চিঠি লিখছেন শ্রী বি. আর. সেন. আই. সি. এস বাংলা সরকারের এডিশনাল সেক্রেটারী। লেখা হচ্ছে ভারত সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারীকে। বিষয় সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লাল নিশান' নামক গ্রন্থের সীকাষ্টমস অ্যাক্টের ১৯নং ধারায় ভারতে প্রবেশ রোধ।

মহাশয়,

১৮৭৮ সালের ১৯নং ধারায় এস এন টেগোরের লাল নিশান গ্রন্থ যাতে স্থল, জল বা আকাশ-পথে বৃটিশ ভারতে প্রবেশ করতে না পারে সেই বিষয় আপনাকে লেখবার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২। লেখকের কার্যকলাপ ভারত সরকারের ভাল করেই জানা আছে। এই প্রসঙ্গে ভারত সরকারের ৯ই জুন ১৯২৭ সালের ডি ২০৩২-২৭ সংখ্যক চিঠির সঙ্গে সঙ্গে যে পত্রালাপ শেষ হয় তার উল্লেখ করতে পারি।

৩। কাউন্সিল সহ গভর্ণর এই অভিমত পোষণ করেন যে এই গ্রন্থটির ভারত প্রবেশ বন্ধ করা উচিত। আমি তাই অনুরোধ করি ভারত সরকার এই মর্মে একটি নিষেধাজ্ঞা জারী করুন। যে বইগুলি সরকার ধরতে পেরেছেন সেগুলি সবই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ইতি

আপনার ইত্যাদি

(স্বা) বি আর সেন

যে আদেশবলে গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত হলো সেটিও তুলে দিলুম :—

Finance Department (Central Revenues)

Notification : Customs

New Delhi, the 5th March, 1932.

No. 9 : In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Sea Customs Act, 1878 (viii of 1878), the Governor General in Council is pleased to prohibit the bringing into British India of any copy of a book entitled "Lal Nishan" by Soumyendranath Tagore, Barlin.

Sd. A. H. Lloyd,

Jt. Secretary to the Govt. of India.

দেশে ফেরবার পর সৌম্যেন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি বই পুলিশের ব্যবস্থায় বাজেয়াপ্ত হলো। আর দুটি বইয়ের খবর জানি যা বাজেয়াপ্ত করা যায়নি বলে পুলিশ নিতান্ত দুঃখিত ছিল। যে বইগুলি বাজেয়াপ্ত হয় সেগুলি হল (১) সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীই কংগ্রেস বিরোধী ; (২) বন্দী ; (৩) চাষীর কথা। এছাড়া আরও কয়েকটি বেআইনী পুস্তিকার খবর পাই কিন্তু সেগুলি বেআইনী ঘোষণার সরকারী কাগজ পত্র এখনো সংগ্রহ করতে পারিনি। যে বই দুটিকে ঠিক আইনের আওতায় না পেয়ে বাজেয়াপ্ত করা গেলনা সে দুটি হল (১) হিটলারিজম ; (২) আন্দামানস্ দি পিনাল সেটেলমেণ্ট অফ বৃটিশ ইম্পারিয়ালিজম।

এই বইগুলির মধ্যে 'হরস্ ইন ঢাকা জেল' এবং 'ওয়েলস অফ বেঙ্গল' 'বন্দী' বইগুলি আমি

দেখিনি অন্য বইগুলি আমি দেখেছি। সে বইগুলির কিছু বিস্তৃত পরিচয় এখানে অবান্তর হবে না।

প্রথম বইটি একটি রাজনৈতিক থীসিস—ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের একটি বিশেষ নীতি এই রচনায় সৌম্যেন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করেছেন। আগে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই করে তাকে তাড়াই, তারপর ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্রের লড়াই করবো—একথা যারা বলে তাদের সমালোচনা এ গ্রন্থের একটা অংশ। আর একটা অংশে ধনতন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে, ধনতন্ত্রের দেশভেদে কোন চরিত্র ভিন্নতা হয় না। সবদেশেই তার শোষণ কার্যের ঐক্য আছে। ভারতবর্ষে কংগ্রেস জমিদার ও মিল মালিকের দল একথা স্পষ্ট করে বলে ঐ থীসিসে ঘোষণা করা হয়েছে, "ইম্পিরিয়ালিষ্ট শাসনের বিরোধী যে তাকে ভারতবর্ষের বুর্জোয়াদের অনুষ্ঠান জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধী হতেই হবে"। প্রকৃতপক্ষে বইটির আক্রমণ সাম্রাজ্য-বাদীদের পক্ষে যেমন তীব্র কংগ্রেসীদের পক্ষেও তেমনি তীব্র। ১৯৩৫ সালের মার্চ-এপ্রিল সংখ্যার 'গণবাণী'তে লেখাটি প্রকাশিত হয় এবং অল্পকালের মধ্যেই ছেপে প্রকাশিত হল। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত হল। সেই বাজেয়াপ্ত নোটিশটি উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল :—

Notification No. 10408 pub,—27th May 1935—In exercise of the power conferred by section 19 of the Indian Press (Emergency power) Act, 1931 (xxIII of 1931), the Governor in Council is pleased to declare all copies whenever found, of a pamphlet in Bengali entitled "Samrajyavad-Virodhee-i-Kangress-Virodhee" by Saumeyendranath Tagore, printed by Probhat Sen at the Kalika Printing works, 30 Hurtuki Bagan Lane, Calcutta, and published by the same from the Ganavani publishtng House at 20 Kedar Bose Lane, Bhowanipore, to be forfeited to His Majesty, on the ground that it appears to the Governor in Council that the said pamphlet contains words of the nature described in clause (h) of subsection (1) of Section 4 of the said Act.

E. N. Blandy

Chief Secretary, to the Govt, of Bengal

দ্বিতীয় যে গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত হল সেটির নাম 'বন্দী'। এ গ্রন্থের কোন কপি আমি দেখিনি। কিন্তু যে নোটিশে এই গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হল তার থেকে জানতে পারি এ গ্রন্থ প্রভাত সেন কর্তৃক প্রকাশিত, শশধর চক্রবর্তী কর্তৃক ৪৫ নং গ্রে ষ্ট্রীটের মিত্র প্রেসে মুদ্রিত এবং ১৯৩৫ সালের ১৫ই জুলাই ১২৯৯ সংখ্যক আদেশে এর প্রকাশ নিষিদ্ধ।

তৃতীয় বাজেয়াপ্ত গ্রন্থের নাম চাষীর কথা। এ গ্রন্থটিও প্রভাত সেন কর্তৃক প্রকাশিত এবং ২২শে নভেম্বর ১৯৩৯ সালের আদেশ বলে বাজেয়াপ্ত। এ গ্রন্থটি অত্যন্ত স্থূলিখিত। ভারতবর্ষের চাষী কেমন করে ইংরেজদের হাতে এবং জমিদার ও ফড়েদের হাতে লুণ্ঠিত হচ্ছে তার তথ্যবহ বিবরণ এ গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু। এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' থেকে উদ্ধৃতি আছে। তাছাড়া কংগ্রেসই যে ক্রমে ক্রমে চাষীদের প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র

মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। শেষ সিদ্ধান্তপোলিটিক্যাল :—"কলওয়ালা আর জমিদারদের কংগ্রেসের কসাইখানায় আমরা চাষীদের যেতে দেবো না। তা যদি দিই তা হলে চাষীর সর্বনাশ করা হবে, দেশের স্বাধীনতার সর্বনাশ করা হবে। কৃষক সমিতি গঠন করে চাষীদের সংগঠিত করতে হবে জমিদারদের অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্যে। তারপর সেই সঙ্ঘবদ্ধ কিষাণ শক্তিকে মজুরদের বিপ্লবী দল টেনে নেবে স্বাধীনতার লড়াইতে"।

'চাষীর কথা' বাজেয়াপ্ত হলো ডিফেন্স অফ রুলস প্রয়োগ করে। নিষেধাজ্ঞাটি নিম্নরূপ :—

No. 6347 P.—22nd November, 1939.

Whereas in the opinion of the Governor the book in Bengali entitled "Chasir Katha" written by Saumyendranath Tagore and published by Prabhat Sen from the Ganabani Publishing House, 220 Cornwallis Street and printed by him at the Rabi Press at 27A Beadon Street, Calcutta, contains prejudicial report of the nature described in clause (7) of rule 34 of Defence of India Rules read with Sub clause (e) of clause (6) of that rule.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (c) of subrule (1) of rule 40 of the said Rules, the Governor hereby declares to be forfeited to His Majesty all copies, wherever found of the said book and all other documents containing copies, reprints translations or extracts from the said book.

আগেই বলেছি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি গ্রন্থ পুলিশ ও সরকারের বিষদৃষ্টিতে পড়েছিল। কিন্তু আইনের কোন ধারায় ফেলতে না পারায় সে বই দুটিকে শেষ পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা যায়নি। একটি হলো 'হিটলারিজম' অন্যটি হলো আন্দামান সংক্রান্ত পুস্তিকা।

'হিটলারিজম' গ্রন্থে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে কোন আক্রমণ নেই। কিন্তু হিটলারকে তখন ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদও তোয়াজ করে চলেছে এবং কমিউনিজমের কোন প্রসার ঘটাবার চেষ্টা কোন বইতে থাকলে তাও বন্ধ করার ইচ্ছা ইংরাজ সরকারের। কিন্তু বিভিন্ন স্তরে চেষ্টা করেও দুঃখিত সরকার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালো যে 'হিটলারিজম' গ্রন্থটিকে বাজেয়াপ্ত করা যাবে না। ১৩৮১, পৌষ সংখ্যা সমকালীনে এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে আলোচনা পাওয়া যাবে 'ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সৌম্যেন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে।

দ্বিতীয় গ্রন্থটি আন্দামান সম্পর্কে। ১৯৩৭ সালে আন্দামানে রাজবন্দীদের উপর নানা ধরণের অত্যাচারের খবর এসে পৌঁছাতে লাগলো। ভারতবর্ষে ক্রমে ক্রমে একটা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে লাগলো—রাজবন্দীদের মুক্ত করে আনতেই হবে। ১৯৩৭ সালে আন্দামান রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলন কমিটি তৈরী হয়। সেই কমিটির আহ্বানে ২রা আগষ্ট যে বিরাট জনসভা হলো, সে সভায় বক্তৃতা করেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের ভাষণটির সঙ্গে আর একটি রচনা সংযোজিত করে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন 'আন্দামান দ্য পিনাল সেটেলমেন্ট অফ ব্রিটিশ

ইম্পিরিয়ালিজম।' বইটি তখন সাড়া জাগিয়েছিল। বাংলা সরকার আবেদন জানালেন ভারত সরকারকে, কিন্তু ভারত সরকার আবার নিষেধাজ্ঞা জারীর আদেশ প্রাদেশিক সরকারকে ঘোষণা করতে বললেন। শেষ পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা জারী হয়নি বলেই মনে হয়, কারণ তার কোন ঘোষণাপত্র পাইনি। কোন দৈনিক পত্রিকাতেও এ মর্মে কোন খবর নেই। তবে একথাও অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে এ গ্রন্থের প্রায় সব কপিই সরকার তুলে নিয়েছেন।

আর একটি গ্রন্থের নিষেধাজ্ঞার আদেশ আমার চোখে পড়েনি। কিন্তু সংবাদপত্রে পুস্তকটির সম্পর্কে নিশ্চিত খবর রয়েছে। ১৯৩৭ সালের ১২ই আগষ্ট সৌম্যেন্দ্রনাথের বাড়ি সার্চ করা হল। ১৩ই অগষ্ট খবর বেরুলো 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' যে তাঁর বাড়ি থেকে কিছু বইপত্র পুলিশ নিয়ে গেছে। খবরে বলা হয়েছে—"Searched the place and seized one copy of Mr Tagore's 'Peasant Revolt in Malabar' which was proscribed by the Government on wednesday last' অর্থাৎ ১১ই আগষ্টে বাংলা সরকার Peasant Revolt on Malabar গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করেন। সৌম্যেন্দ্রনাথের এই গ্রন্থটি ১৯২১ সালের মালাবারের চাষী আন্দোলন সম্বন্ধে রচিত হয়। বোম্বাই থেকে এ গ্রন্থ প্রকাশ করেন টি গোদিয়া ছেপেছিলেন বোম্বাইয়ের গঙ্গা প্রিন্টারিতে উমাশঙ্কর গজানন বৈদ্য। এ ছাড়া আরও তিনটি ক্ষুদ্রাকার পুস্তিকা—Repression in Chittagong, Horrors in Dacca Jail, Wails in Bengal বেআইনী ঘোষিত হয়।

আর একটি পুস্তিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেরই জানা ছিল না। কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রধান নেতাদের অনেককে প্রশ্ন করেছি—কিন্তু কেউই সে বই দেখেন নি। ১২৪৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসীতে 'বিবিধ প্রসঙ্গে' বেরুলো—'মুজফ্‌ফর আহমেদ বাজেয়াপ্ত'/শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'মুজফ্‌ফর আহমেদ' পুস্তিকা গবর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। তাহা হইলে এমন অ-রাজভক্ত মুসলমানও আছেন, যাঁহার বিষয়ে লিখিত বহি বাজেয়াপ্ত হয়।' 'মুজফ্‌ফর অহমেদ' নামে এই গ্রন্থের সংবাদ রাখেন বা প্রত্যক্ষ এ বই দেখেছেন এমন কাউকে এখনও দেখিনি। এ সম্বন্ধে আরও তথ্য সন্ধান করতে হবে।

এ প্রবন্ধ কোন সম্পূর্ণতার দাবী রাখে না। সৌম্যেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক কার্যাবলীর অনেকটাই বিস্মৃতির কবলে চলে গেছে। ক্রমে ক্রমে ঐতিহাসিকের জিজ্ঞাসা নিয়ে তথ্য উদ্ধার করতে হবে। এ প্রবন্ধে তারই সূত্রপাত করা হলো। এ বিষয়ে অন্য কোন তথ্য থাকলে সম্পাদক সমকালীনকে জানালে তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হবে।

লেখনী ও তার লিখন প্রণালী

পূর্ণচন্দ্র দাস

বাংলায় একটি প্রবাদ বাক্য আছে "যার কাজ তা'কে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে"।

সুদূর অতীত থেকে মানুষ তার আপন মনের কথা অপরের কাছে পৌঁছে দিতে কতনা সাধ্য সাধনা করে আসছে। ভবিষ্যত কালের ও বর্তমান কালের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষের কাছে মানুষ তার আপন মনের অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, উপদেশ ও আদর্শ জানাবার ও রেখে যাওয়ার প্রয়াসে যে কত করেছে তার ইয়ত্তা নাই। তার সে প্রয়াস সফল ও সার্থক হয়েছে সেদিন যেদিন সে তার কথাগুলির সংযোজনায় অক্ষরের সৃষ্টি করতে পেরেছে। অক্ষর সৃষ্টির আগে মানুষ চিত্র এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করত। এক একটি চিত্র এক একটি ভাব প্রকাশ করত। এই রেখা চিত্র পাথরের ফলকে পর্বতের গুহায় আজও রয়েছে। অক্ষর সৃষ্টির পরও সে তার মনের কথা লিখেছে শিলায়, কাঠে, মৃৎফলকে। এই লেখা অভ্যাস করার জন্য ব্যবহার করেছে প্রথমে ধূলো তারপর ছুঁই খড়ি। ধূলোয় লেখার ইতিহাস "ধূলা-কুটা পালা" আজও অভিনীত। এই লেখা যদিও ইতিহাস হল তবুও অচল, সচল নয়, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সহজে যেতে পারে না।

হালকা সচল লেখা প্রবর্তনের প্রয়াসে প্রথমে ব্যবহার করা হয় গাছের ছাল আর তার পাতা। তাল পাতায় লেখা বহু প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গেছে। এখন পূজা-পার্বণের মন্ত্রাদি তাল পাতায় লিখতে দেখা যায়। কবচ তাবিজ লিখতে ভূর্জপত্র নামে এক প্রকার গাছের ছাল না হলে হয়ই না। তারপর আবিষ্কার হল কাগজ। কিন্তু দেখাযায় হালকা সচল লেখার প্রবর্তনে সর্বাগ্রে আবিষ্কার হয়েছে কালি। লিখতে চাইলেই লেখা হয় না বা লেখা যায় না, :—

"কালি, কলম, মন,
লেখে তিন জন"।

আগে চাই কালি তারপর কলম আর একাগ্র চিত্ত। কথায় বলে "মুক্তোর মত অক্ষর"। ভাল কালি ভাল কলম না হলে লেখা ভাল হয় না। বহু সাধনায় আজ কলমই মৎস্যাধার; কলমের মধ্যেই থাকে কালি। ছাত্রকে স্কুলে, কলেজে পৃথক করে দোয়াত সঙ্গে বয়ে নিয়ে যেতে হয় না। কিন্তু এমন একদিন ছিল,

"দোয়াত, কলম, দপ্তর,
এই তিন নিয়ে ছাত্তর"।

সেদিন কালি তৈরী হত কলাকসুন্দার (কালকসুন্দী) রস, খুঁদ-চুঁয়া-জল (খুঁদকে ভাজতে ভাজতে পুড়িয়ে তাতে জল ঢেলে সেই জল) আর ভূষা (ধান-সিদ্ধ হাঁড়ি, ঘই, মুড়ি প্রভৃতি ভাজার হাঁড়ির তলায় যে কালি পড়ে।) দিয়ে তৈরী হত 'ভূষা-কালি' কালকাসুন্দির রস ও খুঁদ-চুঁয়া-জল ভূষা-কালির ঔজ্জ্বল্য ও স্থায়িত্ব বাড়াত। বীরভূমের ইতিহাসে আরও উন্নত ধরনের কালি প্রস্তুতের একটি ছড়ার উল্লেখ আছে।

'তিল, ত্রিফলা, সিমুল-ছালা,
ছাগ দুগ্ধে কবি মেলা—

লৌহ পাত্রে লোহায় ঘসি,
ছিঁড়ে পত্র না ছাড়ে মসি'।

এই কালি এত উন্নত মানের যে এতে কাগজ ছিঁড়ে গেলেও লেখা নষ্ট হত না! কালি পুরে রাখা হত কৌড়িয়ায় (কড়ির বোতল)। এর থেকে ঢেলে নেওয়া হত পোড়া-মাটির দোয়াতে। এই দোয়াত ছিল উচ্চতায় চার আঙ্গুল, এর পরিধিও ছিল চার আঙ্গুল। কুমোর বানাত দোয়াত। ঢাকে তৈরী হত এর চার আঙ্গুল চোঙ, চোঙের তলায় ও মাথায় আটকানো হত দুটো চাকতি। মাথায় দিকের চাকতীতে তর্জনী ঢেকোর মত একটি মুখ করা হত। আর এই মুখের মাথায় আধ আঙ্গুল উচ্চতায় এই মুখের মাপে একটি পাতলা আংটি বসিয়ে দিত। (প্রায় আজকালকার টিনের লম্ফ তৈরীর কায়দায় তৈরী হত এই দোয়াত)। আংটিটির নীচের দিকটির বেড় উপরের দিক অপেক্ষা সরু থাকত। এখানকার কুঁজো, কলসী প্রভৃতি মৃৎপাত্রের উপরে জল চুইয়ে না পড়ার জন্য যে রকম প্রলেপ বা পালিশ ব্যবহার করা হয় সেই রকম প্রলেপ বা পালিশ ব্যবহার করা হত।

দোয়াতের গলায় বাঁধা দড়ি ধরে—দোয়াত ঝুলিয়ে, দপ্তর নিয়ে পাঠ শালায় চলত পড়ুয়া। (বই, খাতা, যে চৌকো ন্যাকড়ায় বাঁধা থাকত তাকে বলা হ'ত দপ্তর। মাষ্টার মশায় ছুটির সময় বলতেন "দপ্তর বাঁধ")। কালি চলকে যাতে না পড়ে যায়, তার জন্য দোয়াতের মধ্যে কালিতে চুবিয়ে রাখা হ'ত এক টুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়া।

আমার শৈশবে আজকের দিনের মত স্কুল ছিল না; ছিল পাঠশালা। পাঠ শালার শিক্ষক মহাশয়কে অভিভাবকেরা বলতেন "মাহাতি" আর ছাত্ররা বলত গুরুমশায়। ক্ষিপ্র উচ্চারণে শোনাত 'গুরাঁশ'। পাঠশালায় ছিল না বর্তমানের মত অর্দ্ধোপবেশন ও অর্দ্ধোত্থিত অবস্থার আসন চেয়ার আর আকোটি বিস্তৃত টেবিল, বেঞ্চ কিম্বা হাই-বেঞ্চ—যার উপর বসে বইপত্র রেখে আরামে পা দুলিয়ে পাঠ অভ্যাস করা যায়।

ছাত্রদের বসার আসন 'কলা-বসনার' চাটাই (পাততাড়ি) থাকত বগলে। সম্ভবত বসার আসন তৈরী হয় বলে এতদঞ্চলে কলাবাগলাকে কলাবসনা বলে। কলাবাগলাকে সরু সরু করে চিরে রোদে শুকোতে দিলে ওগুলো শুকিয়ে মাদুরের কাঠির মত হয়ে যায়। কলাবাগলার পাততাড়ি তৈরী করার সময় প্রথমে পাততাড়ি লম্বায় যতহাত হবে তার দ্বিগুণের অপেক্ষা পাঁচ আঙ্গুল বেশি মাপে 'বানি' কাটতে হয়। পাততাড়ি সাধারণতঃ দু'হাত থেকে পৌনে দু'হাত লম্বা ও দেড় হাত চওড়া হ'ত। পাততাড়িতে সতেরটি বাণির দরকার। বাণি পাটের দড়িরই হয়। প্রত্যেকটি বাণির অর্দ্ধাংশে হলুদের দাগ দেওয়া হ'ত। বাণির অর্দ্ধাংশের হলুদ চিহ্নের দু'দিকের দড়ি চার পাঁচ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও সমপরিমাণ পরিধির পোড়া মাটির বা কাঁচা মাটির গোলায় জড়িয়ে গুটিয়ে রাখে। এতদঞ্চলে এই সব 'গোলাকে' গোলা না বলে 'গুলা' বলে প্রতিটি বাণিতে দু'টি করে গুলার দরকার। একটি পাততাড়ি বুনতে চৌত্রিশটি গুলার প্রয়োজন। ঘরের দাওয়ার দুটো খুঁটির মাঝখানে সাড়ে চার হাত মাপের একটা মোটা বাঁশ বেঁধে তার দু'পাশে গুঁণা ভরা প্রত্যেকটি বাণির দু'টি গুলা হলুদ চিহ্নটিকে মাঝখানে রেখে ঝুলিয়ে দেয় সতেরটা বাণি। মোটা বাঁশটিকে বলে 'হ্যাসতাড়া'। এরপর মাদুর বুননের মত এক একটা কাঠি মাঝখানে রেখে একটাকরে বাণি বাদ দিয়ে গুলার ওলট পালটে কাঠিগুলি

বাধা পড়ে। আবার পরের বারে আবার একটি কাঠি রেখে যে বাণি বাকি ছিল তার গুলা ওলট পালট করা হয়। এমনি করে প্রত্যেকবারে দুটি করে কাঠি এক একটি বাণিতে পরস্পর আবদ্ধ হয়। বুননের পর বন্ধিত বাণি পরস্পর আবদ্ধ করে ছালের মত করে দেয়। এই ভাবে জাল-বিনুণীতে কাঠি আর বেরিয়ে যেতে পারে না, দেখতেও সু-দৃশ্য হয়।

গুরুমহাশয় বসতেন মাদুরে। সামনে থাকতো একটি 'ভদ্রা'। জল-চৌকির অপেক্ষা এক বিঘতের একটু লম্বা, সামনের দিকে ঈষৎ ঢালু, ঠিক আজকালকার ডেস্কের মত, ভিতরে বই, কলম রাখার মত জায়গা থাকতো। স্বরে—অ, স্বরে—আ করে ডাকতে আর লিখতে লিখতেই পড়া শুরু হত। বর্ণ পরিচয়ের সাথে সাথেই স্বর বর্ণের ও ব্যাঞ্জন বর্ণের পরিচয় হয়ে যেতো। পাঠক্রম মান ও শ্রেণী দুই ভাগে বিভক্ত থাকলেও দুইই এক পর্যায়ে চলতো। মানের সঙ্গে সব সময় এক যোগ দিয়ে শ্রেণীর পরিচয় হ'ত। যেমন প্রথম মান—দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে দশম মান—একাদশ শ্রেণীতে মান ও শ্রেণীর শেষ।

গ্রামের লোকদের দশম মান পর্যন্ত লিখন-পঠনের কোন সুবিধাই ছিল না। মহকুমা শহর বা জেলা শহর ছাড়া কোথাও দশম মান পর্যন্ত স্কুল ছিল না। কোনও কোনও বর্ধিষ্ণু গ্রামে মধ্য ইংরাজী বা মাইনর স্কুল ছিল।

এখনকার মত শিশুশ্রেণী সেদিন ছিল না। প্রথম শ্রেণী থেকেই শুরু। প্রথম শ্রেণী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণ-পরিচয়—প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল, আর ছিল শিশুবোধ ব্যাকরণের শতকিয়া, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, বুড়িকিয়া, পণকিয়া, চোককিয়া, কাঠাকিয়া সেরকিয়া, আর শুভঙ্করের আর্যা (দর দাম নির্ণয়ের সহজ সূত্র, বিঘা-কালি, কাঠা-কালি ইত্যাদি!) তিল, কাক, ক্রান্তি, দন্তি পর্যন্ত মুখস্থ করে উঠতে দাঁত-ভেঙে বহু শিশুই বোধ হারিয়ে স্কুল ছেড়ে পালাত। এরপরতো আরও থাকতো পাই পয়সা থেকে আরম্ভ করে বিদেশী মুদ্রা ও তরল পদার্থ ওজনের সংজ্ঞা। শিশুবোধে আরও থাকতো উল্লাকের গুরু দক্ষিণা, আরুণির গুরু ভক্তি, দাতা কর্ণ উপাখ্যান—বলতে গেলে পুরো সন্দীপন পাঠশালা আর গঙ্গা মাহাত্ম্য বইখানি তৃতীয় মান পর্যন্ত পড়ান হত। সকালে, বৈকালে দুই বেলাই পাঠশালা বসতো। একডাক রাস্তার দূর থেকে পাঠশালার কোলাহল শুনা যেতো, যারা পড়তো তারা ঠিকই মনদিয়ে পড়তো আর যারা না পড়তো তারা ঐ কোলাহলের মাঝখানে শেয়াংটুকুতে যোগ দিয়ে নিজেদের দুষ্টমি ঠিক চালিয়ে যেতো। বিশেষ করে সকালবেলায় প্রথমশ্রেণীর পুরাতন পাঠাভ্যাসের সময় যখন সর্দ্দার পোড়ো প্রথমে বলতো 'চার কড়ায় এক গণ্ডা' তখন যারা ভাল ছেলে তারা পরে সমস্বরে বলতো 'চার কড়ায় একগণ্ডা' আর যারা পড়ার মাঝখানে নিয়মিতভাবে দুষ্টমি চালিয়ে যেতো তারা কেবল শেষাংশটুকুন আবৃত্তি করে (এমন কি গণ্ডাটি পর্যন্ত না বলে) বলতো 'আণ্ডা'। যাকে আমরা পরিণত বয়সে (তখনকার দিনের পাঠ ও পাঠাভ্যাস উভয়ই না থাকা সত্ত্বেও) ব্যাঙ্গোক্তি করি 'গণ্ডায় আণ্ডা' যখন কেউ যদি কারুর কথা না বুঝে সায় দেয়। ঘড়ির সঙ্গে কোন সম্পর্কই ছিল না, ছায়া দেখে ছুটি। সবাই তাকিয়ে থাকতো কখন ছায়া আসবে পায়ের তলায়। ছুটির সময় গুরুমশায় কোন কোন দিন বলতেন 'দপ্তর বাঁধ' আবার কোন কোন দিন বলতেন 'চটিইগুটা' (পাত্‌তাড়ি গোটাও)। বলার সাথে সাথে যে যার পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে সারিবদ্ধভাবে পর

পর একে একে গুরুমশায়ের কাছে উপস্থিত হত আর তিনি প্রত্যেকের হাতে খুব কম জোরে একবার করে বেতের ঘা লাগিয়ে দিতেন। মধ্যে মধ্যে বলে উঠতেন বাড়ী গিয়ে যদি কেউ বেশি দুষ্টমি কর এই বেতের ঘা পিঠে পড়বে। বেত্রাঘাতের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এখন বেশ বুঝতে পারি এটি করার ফল বাল-সুলভ চপলতায় ছাত্ররা হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ে গণ্ডগোল করার সুযোগ পেত না। প্রথম ও দ্বিতীয় মানের ছাত্রদের বৈকালে হাতের লেখা লিখতে হত ও দেখাতে হত। লেখা-পড়ার শ্রেণী-বিন্যাসের মত লিখতে গিয়ে কলমেরও শ্রেণীবিন্যাস ছিল। শর, কলমী, কঞ্চি ও পালক। চার মানের চার প্রকারের কলম হলেও চিলের পালকের কলম ততদিন সঙ্গী ছিল যতদিন পর্যন্ত 'জি', মার্কা নিব আর 'জে-বি-ডি' মার্কা কালি বেরিয়েছিল। প্রথম শ্রেণীর প্রথম লেখকদের কাছে শরের কলম লেখার পক্ষে বিশেষ মোলায়েম। লেখক একটু লেখায় অভ্যস্ত হলে কলমী ও পরে কঞ্চির কলমে লেখার যোগ্যতা অর্জন করতেন। তৃতীয় মান ও চতুর্থ মানের অর্থাৎ নিম্ন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকের শেষের ধাপের লিখিয়ে পড়িয়েদের বেলায় চিলের পালকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। পাকা করণিকের আবার কঞ্চির কলম না হলে ভাল লেখা সরতো না। তার আঙুল মাপের কলমই সত্যিকারের পয়া কলম। এই হল দক্ষ করণিকের মন্তব্য। ফোলা শরের (যে শর গাছের ফুল বেরিয়ে গেছে।) কলমই হোক বা দো-সালা বাঁশের কঞ্চিই হোক কিম্বা কলমী তার চিলের পালক যাই বলুন না কেন কলমের বাহাদুরী তার 'কৎ' কাটার কাছে। কলমকে কলমকাটা ছুরি দিয়ে প্রথমে 'অতি সূক্ষ্মাগ্র করে নিয়ে পরে ঐ ছুরির ডগা দিয়ে তার ভিতরকার অঁতি (শাঁস) কেটে বের করে দিয়ে এমনভাবে কাৎ করে 'কৎ' কাটতে হয় যাতে কৎএর মুখে দুটি কোণের সৃষ্টি হয়। উপরের দিকের কোণটি হবে স্থূলকোণ ও নীচের দিকের কোণটি হবে সূক্ষ্মকোণ। এক কথায় দুটি কোণ মিলে দুই সমকোণের সমান। এর পর সূক্ষ্মাগ্র ছুরির সাহায্যে অতি সাবধানে কৎএর মাঝখানে চিরে দিতে হয় যার ভিতর দিয়ে কালির ধারা ঝরতে ঝরতে কৎএর মুখের দিকে এগিয়ে এসে লেখার মধ্যে প্রবাহিত হয়।

কলম ভাল হলেই লেখা ভাল হয় না; প্রথমে কলম ধরতে শেখা চাই। কলমকে কাৎ করে মধ্যমার শেষ পর্বের উপর রেখে তর্জনীর অগ্রভাগ দিয়ে চেপে রাখতে হবে ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দিয়ে টিপে তাকে শুইয়ে ফেলতে হবে বৃদ্ধা ও তর্জনীর কোলে। তারপর কনিষ্ঠাঙ্গুলী দিয়ে কাগজকে সমান করে চেপে ধরে কলমের কৎএর স্থূলকোণটিকে উপরের দিকে ও সূক্ষ্মকোণটিকে নীচের দিকে রেখে উভয়ের ভূমি কৎ-রেখাটিকে কাগজের ভূমির উপর রেখে লেখক কলম চালিয়ে নিয়ে যান।—

না নারী আউ মহরী,—
এ তিনক্ষর 'বা' বইরী।

নৌকা, রমণী, আর কেরাণী এই তিনজনের বাতাস শত্রু। বাতাস একটু বেগে প্রবাহিত হলে যেমন নৌকার পক্ষে বিপদ হয় ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় ও মেয়েদের কাপড়চোপড় বেসামাল করে দেয় ঠিক তেমনি কেরাণীর কাগজপত্র উড়িয়ে তাকেও বিব্রত করে তোলে। তাই দক্ষ করণিক কনিষ্ঠাঙ্গুলি দিয়ে সব সময় কাগজকে চেপে তাকে বশে রাখেন। স্থূলকোণটিকে উপরের দিকে রেখে লিখলে অক্ষরের উপরের অংশটি সব সময় স্থূল হয়। সূক্ষ্ম লেখায় সূক্ষ্মকোণটিকে উপরের দিকে রাখতে হয়। আর কলমের মুখ ও কৎকেও একটু সূক্ষ্ম করে কাটতে হয়।

লেখিব গটা, পড়িব ছাটা,
তেবেত করণর ব্যাটা।

করণের ছেলে যে দক্ষ কারণিক তার লেখা সব সময় প্রাঞ্জল স্পষ্ট গোটা গোটা হবে আর সে সব রকমের টানা ছাটা লেখা পড়তে পারবে। এইটাই করণ-পুত্রের পরিচয়। এদিকে মনে-রাখতে হবে,— 'সমানি সমশির্ষাণি,—
বিরলানি ঘনানিত।'

শব্দমধ্যস্থিত অক্ষরগুলি হবে সমান ও ঘন ঘন। তাদের মাথাগুলিও সব সমান হয়ে এক সমরেখায় চলবে। শব্দগুলি হবে বিরল অর্থাৎ পৃথক পৃথক থাকবে একটি আর একটির সঙ্গে মিশে যাবে না, তবেই সকলে বুঝতে পারবে শব্দরূপ ব্রহ্মকে। শুধু শব্দ-ব্রহ্মকে বড় করে দেখলে চলবে না; শব্দ মধ্যস্থিত অক্ষর ও তার মাত্রার দিকে লক্ষ্য রাখাও লেখকের গুরু দায়িত্ব রয়েছে যার একটু ত্রুটি হলে অর্থবিভ্রাট ঘটে যায়। এই জন্য আমরা আমাদের হিন্দুধর্মের পূজার মন্ত্রগুলির শেষে অক্ষর ও মাত্রা ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে— 'যদক্ষর পরিভ্রষ্ট মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ ভবেৎ
পূর্ণ ভবতু তদসম.....।'

লেখার গতি দু'রকমের বামা ও দক্ষিণা। অক্ষরগুলি ঈষৎ বামদিকে হেলে বা বেঁকে বেঁকে চললে বামা অর্থাৎ মেয়েলি হাতের লেখা আর অক্ষরগুলি ঈষৎ ডান দিকে হেলে বা বেঁকে বেঁকে চললে দক্ষিণা অর্থাৎ পুরুষালি হাতের লেখা। সোজা সোজা অক্ষর কাঁচা হাতে লেখার প্রমাণ। সে লেখার গতি আছে বলে মনে হয় না, নিশ্চল। দেখতেও সুন্দর হয় না।

তখনকার দিনের জমিদারী সেরেস্তা ও কাছারী প্রভৃতি কার্যালয়ের করণিকদের লেখার জন্য ডেস্কের মত ভদ্রাসনের ব্যবস্থায় উপবেশন পদ্ধতি বা এখনকার অফিস আদালতের চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থায় আয়াসী সুখকর অর্দ্ধোপবেশন পদ্ধতির কোনটিই গৃহমধ্যে গৃহীত লেখার ব্যবস্থায় তখনও গৃহীত হয়নি এখনও না। আবহমানকাল ধরে গৃহী তার গৃহমধ্যে মাদুরের উপর উবুড় হয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় পা দু'টিকে অর্ধলম্বিত করে বাঁ হাঁটুর উপর ডান হাঁটু রেখে, বাম কনুইএর উপর দেহভার ন্যস্ত করে ডান হাত দিয়ে লিখতে শুরু করেন। সেই সঙ্গে কাগজকেও ধরে রাখেন বাম হাত দিয়ে।

কেবল বাঁধা ধরা নিয়মের মধ্যে লেখা যায় না বা লিখে লেখার নিয়মকে বেঁধেদেওয়া যায় না। লেখা একটি শিল্প। শিল্প যেমন একটি সাধনার বস্তু লেখাও তেমনি একটি সাধনার বস্তু। যেমন করে বসলে যেমন কলম ধরে লিখলে লেখা ভাল হবে ও লেখাকে নিজের ভাল লাগবে ঠিক তেমনি করে বসে কলম ধরে লেখককে লিখতে হবে।

বর্তমানে কলম ও তার সংরক্ষণ প্রণালী স্বয়ম-সম্পূর্ণ। কলমের মধ্যেই তার কালির পাত্র, ঢাকনা, আর পকেটের মধ্যে আটকিয়ে ঝুলিয়ে রাখার জন্য 'আটকানি' ইত্যাদি সব মিলিয়েই কলম। আগে তা ছিল না। লেখার শেষে কলমকে ধুয়ে মুছে তার মুখটিকে উপরের দিকে করে একটি বাঁশের চোঙার মধ্যে রেখে দিত। বাঁশের চোঙার মাথার দিকে ফুটো করে তাতে দড়ি বেঁধে দেওয়ালে টাঙিয়ে দিত। যখন যে কলমের দরকার সেটি বের করে নিত।

মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্ত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

সুদূর শ্রীহট্টে বাস করতেন গৌড়ের অন্যতম নৃপতি গোবিন্দ রায়। তাঁরই সনির্বন্ধ অনুরোধ, বিনীত আহ্বান আর প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে দূত এসেছিলেন রাঢ় দেশের সপ্তগ্রামে, প্রখ্যাত মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ চক্রপাণি দত্ত মহাশয়কে নিতে; কারণ মহারাজা গোবিন্দ রায় যুবই অসুস্থ, শ্রীহট্টে সুপণ্ডিত আয়ুর্বেদ চিকিৎসক নাই।

চক্রপাণি সবই শুনলেন, কিন্তু ঐ সুদূর শ্রীহট্টের কচ্ছভূমিতে (পার্বত্য ও আনূপ দেশ) যেতে রাজি নন। সেখানে গঙ্গা নাই, যমুনা সরস্বতী ও নাই।

রাজার পত্র বাহক দুঃখিত মনেই ফিরে গেলেন। রাজপত্নীর চিন্তা হল। স্বামীর জীবনাশঙ্কায় অস্থির চিত্ত হয়ে অবশেষে স্থির করলেন তাঁর যাবতীয় অলংকার খুলে দিয়ে একটি প্যাটরায় ভরে তাতে একখানি চিঠিতে লিখলেন আপনি এলে এই অলংকার আবার পরবো, আর যদি না আসেন, এবং রাজার মৃত্যু অবধারিত হয়, তবে তার মৃত্যুর সঙ্গে আমারও মৃত্যু অনিবার্য্য। অতএব নারী বধের পাপ আপনি গ্রহণ করবেন।

দূত আবার ফিরে এলেন সপ্তগ্রামে। চক্রপাণি চিঠি পড়লেন অলংকার গুলিও দেখলেন, ভয় হল প্রগাঢ়। বিশেষ চিন্তায় চিন্তিত হয়েই দূতকে দু'দিন অপেক্ষা করতে বললেন, অবশেষে তিন পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে রাজদূত সহ শ্রীহট্টে গোবিন্দ রায়ের রাজ বাটিতে উপনীত হলেন।

একথা লিখেছেন শ্রীহট্টের দত্ত বংশীয় কবি গোপীনাথ দত্ত মহাশয়। এই দত্ত মহাশয়ের পুঁথি-খানি আবিষ্কার করেন চক্রপাণি দত্ত মহাশয়ের বংশধর বলে খ্যাত শ্রীহট্টের গভর্নমেণ্ট প্লীডার রায় বাহাদুর প্রমোদ চন্দ্র দত্ত বি এল মহাশয়ের কাছ থেকে বসন্তকুমার সেনগুপ্ত বি এল মহাশয়। সেন মহাশয়ের নিবাস ছিল নোয়াখালির পশ্চিম প্রান্তে। গোপীনাথ দত্তের পুঁথি প্রকাশের তারিখে দেখা যায় বাংলা ১৩২৬ সাল। পুথি থেকেই জানা যায় প্রাতঃস্মরণীয় কবিরাজ চক্রপাণি দত্ত মহাশয়ের তিনটি পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আবার ফিরে আসেন নিজ জন্মভূমি সপ্তগ্রামে। অপর দুই পুত্র শ্রীহট্টেই বসবাস করেন রাজা গোবিন্দ রায় প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি বিশাল জমিদারীতে। সে স্থানের নাম 'গযার'। দ্বিতীয় পুত্রের নাম মহীপতি দত্ত। কনিষ্ঠের নাম মুকুন্দ দত্ত। মহীপতি দত্তেরই বংশধরগণ অদ্যাবধি শ্রীহট্টের প্রখ্যাত বৈদ্য বংশীয় সন্তান। তাদের অনেকের উপাধি চৌধুরী, দত্ত খাঁ, দত্ত শর্মা, রায় ঠাকুর প্রভৃতি।

কবি গোবিন্দ নাথ দত্ত মহাশয়ের পুঁথি খানির অধ্যায় চারটি। আদিথেকে অন্ত পর্যন্ত বিষয় গুলির মধ্যে দত্ত বংশীয় বৈদ্যসন্তানগণ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কার বংশ শ্রীহট্টে, দিনাজপুরে, নোয়াখালিতে এবং কুমিল্লায় এসে বাস করেছেন তারই বিস্তৃত কাহিনী বর্ণনা করা আছে।

জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে এবং অপর দুই পুত্রকে শ্রীহট্টে রেখে চক্রপাণি দত্ত মহাশয় 'সপ্তগ্রামে' ফিরে এলেন। সেই থেকেই শ্রীহট্টে বৈদ্য সন্তানের বাসভূমির পীঠস্থান স্থাপিত হয়।

এমন ইঙ্গিত ইশারা কিন্তু চক্রপাণি দত্ত মহাশয় নিজের গ্রন্থাবলিতে দেন নাই। তার যে কয়খানি প্রখ্যাত গ্রন্থ—(১) দ্রব্যগুণ সংগ্রহ (২) চক্রদত্ত (৩) চরক সংহিতার টীকা এবং (৩) বৈদ্যক-শব্দাভিধান এদের মধ্যে একমাত্র 'চক্রদত্ত' নামক গ্রন্থের শেষে আত্মপরিচয়ের একটি সূত্র রেখেছেন—সে সূত্রটির দ্বারা কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যায় না চক্রপাণি দত্ত মহাশয় কত শতকের পুরুষ। তবে তাঁর ঐ শ্লোকটির ব্যাখ্যা করে শিবদাস সেন মহাশয়ই বলেছেন চক্রপাণি দত্তের আমল পালরাজ বংশের রাজ্যকালে। চক্রদত্তের শ্লোক—

গৌড়াধিনাথ রস বত্যধিকার পাত্র-নারায়ণস্যতনয়ঃ সুনয়োঽন্তরঙ্গাৎ
ভানোরনু প্রথিত লোধ্রবলী কুলীনঃ শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্তৃপদাধিকারী।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শিবদাস বলেছেন—গৌড়াবিনায়ঃ নয় পালদেবঃ, তস্য রসবতী মহানসং তস্যাধিকরী তথা পাত্র মিতি মন্ত্রী। ঈদৃশা নারায়ণঃ তস্য তনয়ঃ, সুনয়ইতি নীতিমান্। অন্তরঙ্গাৎ লব্ধান্তরঙ্গ পদবিকাৎ জনোরনু তেন ভানো রনুজ ইত্যথঃ। বিদ্যাকুলসম্পনো ভিষক্ অন্তরঙ্গ ইতুচ্যতে। লোধ্রবলী সংজ্ঞক দত্তকুলোৎপন্নঃ।

এই ব্যাখ্যার সূত্র ধরেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর হিন্দুরসায়ণ বিদ্যার ইতিহাসে (Vol-1) বলেছেন একাদশ শতকের মধ্যভাগে নয়পালদেব রাজত্ব করতেন। আচার্য রায়ের অভিমতের অনুসরণ করে পৃথিবীর ইতিহাস প্রণেতা দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ও বলেছেন (তৃতীয় খণ্ডে) ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে যেহেতু নয়পাল দেবের রাজ্যকাল সেইহেতু চক্রপাণি দত্তও ঐ একাদশ শতাব্দীর ব্যক্তি। চক্রপাণির পিতার নাম নারায়ণ, তিনি গৌড়েশ্বর নয়পালের রাজচিকিৎসক।

কিন্তু চক্রপাণি শুধু বলেছেন গৌড়াধিনাথের পাকশালার অধ্যক্ষ নারায়ণ আমার পিতা, আমার দাদার নাম ভানু, লোধ্রবলীর কুলীন আমি, এই গ্রন্থের রচয়িতা আমি।

চক্রপাণির দেওয়া পরিচয় থেকে একটুকুও বোঝা যায় না, তিনি নয়পাল রাজার আমলের লোক, আর বোঝা যায় না লোধ্রবলীর কুলীন বললে কি বোঝা যায়।

তবে তাঁর গ্রন্থের টীকাকার শিবদাস সেন মহাশয়ও খুব প্রামাণ্য ব্যক্তি, হঠাৎ তাঁর কথায় সন্দেহ করা যায় না। শিবদাস সেন 'চক্রদত্ত' গ্রন্থটীকায় আত্মপরিচয় দিয়ে বলেছেন, আমার পিতা অনন্ত সেন, তিনি গৌড়ভূমির অধিপতি 'বার্বাকশাহের' শ্রদ্ধাভাজন চিকিৎসক ছির্লেন।

বার্বাক শাহের রাজ্যকাল ১৪৬০ থেকে ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে। অতএব পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অনন্ত সেন এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শিবদাস সেন। ঐ সময়েই তিনি চক্রপাণি দত্তের দু'খানি গ্রন্থের (দ্রব্যগুণ ও চক্রদত্ত) টীকা লেখেন। অর্থাৎ বাংলার বিখ্যাত শাব্দিক, বৈয়াকরণ, টীকাকার, এবং বৈদ্যকুলের প্রামাণ্য কুলপঞ্জিকাকার মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক মহাশয়ের পিতামহের সমকালীন ব্যক্তি ছিালন শিবদাস সেন। উভয়ই এক গোত্রীয় একই বীজীপুরুষের বংশধর। মালঞ্চের (ফুলিয়ার) বিনায়ক সেন এই উভয় পুরুষের আদি পুরুষ। কারণ বিনায়ক সেনের বংশে রোষ সেন, নারায়ণ সেন এবং সাহি সেনের পর থেকেই চারটি ধারার উৎপত্তি। সাহিসেন প্রথম পুত্র। তাঁরই বংশে ভরত মল্লিকের জন্ম। তার দ্বিতীয় পুত্র কাকুৎস্থসেনের বংশে অনন্ত সেনের জন্ম। ভরত মল্লিকের পিতামহ ছিলেন গোপীনাথ মল্লিক আর অনন্তকালের পিতামহ অনন্ত সেন একই সময়ে এবং

একই জেঠতুতো খুড়তুতো ভাইএর বংশধর।

অতএব শিবদাস সেনের ব্যাখ্যাটিতে আস্থা রাখতেই হয়। তবুও একটু খুঁত থাকে। সেটা হল, চক্রপাণি বলেছেন আমি লোধ্রবলী কুলের কুলীন নারায়ণের সন্তান। এই কুলীন শব্দটির প্রচলন কত শতক থেকে? অনেক পণ্ডিতই স্থির করেছেন বল্লাল সেন এবং লক্ষ্মণ সেনের আগে কুলীন কথাটির প্রচলন যখন হয় নাই অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকেই বাংলার বৈদ্য ব্রাহ্মণের কৌলিন্য শ্রেণীর উৎপত্তি। অতএব চক্রপাণি দত্ত দ্বাদশ শতাব্দীর সম সাময়িককালের ব্যক্তি। কারণ লক্ষ্মণ সেনের যে তিনখানি তাম্রশাসন (১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দিনাজপুরে। দ্বিতীয়টি ডায়মণ্ড হারবারের সুন্দরবনে তৃতীয়টি অক্ষয় মৈত্রের আবিষ্কৃত রঘুদেব শর্মাকে প্রদত্ত) পাওয়া গিয়াছে সেগুলিতে স্পষ্ট লেখা আছে—

শ্রীমলক্ষ্মণ সেনো নারায়ণ দত্তং সন্ধিবিগ্রহিকম্।
ইহ ঈশ্বর শাসন দানে দূতং বিদধাতু নরনাথঃ ॥ (১)

শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেনো ক্ষোনী ভানু সান্ধিবিগ্রহিকেসা বিপ্রবাধিনায়ঙ্করাৎ
কুক্ষিধরস্য অস্য শাসনীকৃতম্। (২)

শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেবো নারায়ণ দত্ত সান্ধিবিগ্রহিকং রঘুদেবং
শাসনে কৃত দূতং ভূমণ্ডলীবলভিৎ (৩)

এই তিনটি তাম্র শাসনের পাঠ দেখে (গৌড়মালা ১ম ভাগ—২য় খণ্ড, ১১০—১২০ পৃষ্ঠা) তাঁরা নির্বাচন করেন লক্ষ্মণ সেনেরই সন্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্তের পুত্র চক্রপাণি দত্ত। তাছাড়া ভানু নামটিও লক্ষ্মণ সেনের সন্ধিবিগ্রহিক দূতের।

তাছাড়া নয়পাল দেবের যতগুলি প্রস্তর লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে নারায়ণ দত্তের নাম পাওয়া যায় না।

এইভাবে দুদিক থেকে প্রমাণপঞ্জী উদ্ধৃত করে যাঁরা বলেন চক্রপাণি দত্ত মহাশয়ের অবস্থানকাল একাদশ শতাব্দীর না হয়ে দ্বাদশ শতাব্দীর সমসাময়িক হওয়াই যুক্তিযুক্ত, তাঁদের প্রথম যুক্তিটির খণ্ডন (লোধ্রবলী কুলীনঃ) কিন্তু এইভাবে—বৈদ্যব্রাহ্মণ কুলের অন্যতম কুলপঞ্জিকাকার দুর্জয়দাশ বলেছেন—

মালঞ্চঃ সেনহাটিচ ধন্বন্তরি কুলোদভুবাম্। তেহট্ট শক্তিগোত্রস্য শ্রীখণ্ডোগুপ্তদাশয়োঃ। লোধ্রবলীচ দত্তানাং সমাজাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

অর্থাৎ মালঞ্চ (ফুলিয়া) এবং সেনহাটি (খুলনা) এই দুটি স্থান ধন্বন্তরি গোত্রের কুলীন স্থান। শক্তিগোত্রের তেহটা (নদীয়া জেলা), কাশ্যপ ও মৌদগল্য গোত্রের কুলীনভূমি শ্রীখণ্ড, আর দত্তবংশীয়দের কুলীন স্থান 'লোধ্রবলী' গ্রামটি কোথায় এনিয়ে একবার প্রশ্ন উঠেছিল আমার জ্যেঠা মহাশয় ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রখ্যাত কবিরাজ স্বর্গীয় বারাণসীনাথ গুপ্ত বৈদ্য রত্ন মহাশয়ের কাছে, প্রশ্ন করেছিলেন রঘুনাথপুরের স্বর্গীয় কবিরাজ অনাথনাথ রায় ও স্বর্গীয় পঞ্চানন রায় মহাশয়। ওদের ও প্রশ্নের উত্তরে কবিরাজ বলেছিলেন বীরভূম জেলার (তখন হয়তো বর্ধমানের ভিতর) রদীপুর গ্রামটিই এককালে 'লোধ্রবলী' নাম ছিল, কালে রদীপুর।

তা যাক। এককালে লোধ্রবলীর কুলীন বৈদ্য ব্রাহ্মণের এত সম্মান ছিল যে, ভরত মল্লিক মহাশয় তাঁর চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন অজ্ঞাত সেন বংশোদ্ভব অপেক্ষা পরিতোষ দত্তাদি

বংশীয়গণ শ্রেষ্ঠ। 'বরং দত্তাদয়ঃ শ্রেষ্ঠা বিজ্ঞতা চরণাদিকাঃ। নতু সেনা দয়ো বৈদ্যা অজ্ঞাতা ইতিসম্মতাঃ' সেই জন্যই চক্রপাণি দত্ত মহাশয় তাঁর পিতৃপিতামহের আদি সমাজ 'লোধ্রবলী'র কুলীন বলতে গৌরব বোধ করেছেন। চন্দ্র প্রভাকার বলেছেন দত্ত উপাধি বৈদ্য ব্রাহ্মণদের ১২টি গোত্র (শাণ্ডিল্য, কৌশিক ঘৃতকোশিক, কৃষ্ণাত্রেয়, কাশ্যপ, মৌদগল্য, গৌতম, পরাশর, আত্ত, আত্রেয়, ভরদ্বাজ, অগ্নিবেশ)। সেইজন্যই অদ্যাবধি দত্ত উপাধি বৈদ্যব্রাহ্মণ কুলে যে সব মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করে বৈদ্যব্রাহ্মণ শ্রেণীকে ধন্য করেছেন তাঁরা বাংলার ইতিহাসে চিরপূজ্য হয়ে আছেন— ১। লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত কবি শরণ দত্ত, ২। বাগভট্ট গ্রন্থের টীকাকার অরুণ দত্ত, ৩। মাধব নিদানের টীকাকার শ্রীকণ্ঠ দত্ত। ৪ সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ রচয়িতা ক্রমদীশ্বর দত্ত ও তৎপিতা চক্রপাণি (৫) বর্ধমান রাজবাটি: কবিরাজ ৺রাম কমল দত্ত (৬) কৃষ্ণনগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মহাত্মা উমেশ চন্দ্র দত্ত (৭) ত্রিপুরার প্রখ্যাত অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত, (৮) ঢাকা বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক শশিভূষণ দত্ত (৯) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের খ্যাতনামা আচার্য্য সীতানাথ দত্ত (তত্ত্বভূষণ) ইত্যাদি। তাছাড়া শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের লীলা সহচর বৈষ্ণব বাসুদেব দত্ত ও মুকুন্দ দত্ত।

অতএব চক্রপাণি দত্ত মহাশয় যে নিজের কুলগৌরবকে চিহ্নিত করতে লোধ্রবলী কুলীন শব্দটি ব্যবহার করেছিল এটি সার্থক। তাতে বলা যায় না এই কৌলীন্য জ্ঞাপনটি লক্ষ্মণ সেনের আগে হতেই পারে না, এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না তবে 'কুলীন' শব্দের রূঢ়ি অর্থের প্রয়োগে যাঁদের দৃষ্টি তাঁদের যুক্তি প্রসারিত বলা যায় না। দ্বিতীয় কথা নয়পালের মন্ত্রিসভায় 'নারায়ণ' দত্তের নাম পাওয়া যায় না বলেই চক্রপাণির পিতা লক্ষ্মণ সেনেরই সন্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্ত হবেন এ সিদ্ধান্ত সর্বাংশে মান্য হয় না। কারণ লক্ষণ সেনের আমলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন নাম পরিভাষা কিংবা বুদ্ধ বা তাঁর সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য্যদের নাম কোন প্রকারে গ্রহণ করে কেউ তার রচিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করতেন এমন দৃষ্টান্ত নাই। সে তুলনায় পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধদের নাম তারা যেমন শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করতেন তেমনি আর্য্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পূজনীয় নামও তাঁরা তেমনি সমাদর করে গ্রহণ করতেন এই জন্যই চক্রদত্তের গ্রন্থে দুই সম্প্রদায়ের (আর্য্য ও বৌদ্ধ) পূজনীয়দের নাম তাদের উদ্দেশ্যে পূজা দানের ব্যবস্থা উপন্যস্ত করা রয়েছে।

অপর কথা, নয়পাল দেবের বৈদ্য ব্রাহ্মণদের প্রতি ছিল শ্রদ্ধা ছিল স্বাভাবিক। তাঁর রাজ্য কালের ১৫ বছর যখন পূর্ণ হয়, সেই সময় তিনি গয়ার 'বিষ্ণুপাদ মন্দির' বলে কথিত স্থানে নৃসিংহ মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময় কার যে শিলা প্রশস্তি তাতে পরিষ্কার লেখা আছে 'বৈদ্য বজ্রপাণি……। আবার তৃতীয় বিগ্রহ পাল দেবের রাজত্বকালে যখন বিশ্বরূপ গয়ায় আর একটি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন তখনও প্রশস্তি রচয়িতার নাম বৈদ্য শ্রী ধর্মপাণি……। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ড ১৮৮ পৃষ্ঠা। তাছাড়া পাল বংশের সময়েই বাংলায় বৈদ্যক শাস্ত্রের গবেষণা, বৈদ্যকগ্রন্থের রচনা, এবং বৈদ্যক গুরুদেব উদার উপদেশের প্রচার সর্বাধিক বিস্তৃত হয়েছিল। সর্বভারতীয় বৈদ্যক 'শেষ' হিসাবে খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকে ধন্বন্তরি নিঘণ্ট এবং ষষ্ঠ শতকের আগে অমর কোষের বৈদ্যক বিভাগ রচিত হলেও বাংলায় কোন বৈদ্য একাদশ শতকের আগে বৈদ্যক গ্রন্থ এবং বৈদ্যক কোষ রচনা করেন নাই। এই দৃষ্টিতে চক্রদত্তই প্রথম বৈদ্যগুরুর স্থান অধিকার করেছেন। ৮ম শতাব্দীর মাধব কর এ বিষয়ে অগ্রণী হলেও

তিনি যে বাঙালী ছিলেন এমন নজীর ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে পাওয়া যায় না।

চক্রপাণি দত্ত ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী। তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ ৪ খানি। তাদের মধ্যে চরক সংহিতার টীকা এবং 'চক্রদত্তই' প্রসিদ্ধতম। আর দুখানি হোলো বৈদ্যক শব্দাভিধান ও দ্রব্যগুণ সংগ্রহ।

চক্রপাণি দত্ত মহাশয়ের রচিত চরক সংহিতার টীকাটির আগে এই বাংলাতেই আরও কয়েকখানি টীকা রচিত হয়েছিল, সে সংবাদ বিস্তৃত করে না পাওয়া গেলেও চক্রপাণির চরক টীকার মাঝে মাঝে সে সব টীকার উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। তা ছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বহু বৈদ্য চরক সংহিতার টীকা ও ভাষ্য রচনা করেছিলেন যেমন ১। আষাঢ় বর্মার পরিহার বার্তিক (নবম খ্রীষ্টাব্দ) ২। সর্বহিত মিত্রের চরক ভাষ্য (নবম শতক) ৩। এই শতকে জেজ্জটাচার্যও টীকা করেছেন চরকের (৪) কজ্জটের পিতা কৈয়ট লিখেছেন ভাষ্য প্রদীপ (নবম) ৫। আর কজ্জটাচার্য লিখেছেন নিরন্তর পদ ব্যাখ্যা। ৬। সুধাকর নামে একজন বৈদ্যাচার্যও টীকা লিখেছেন দশম শতকে এ সংবাদ জানা যায় চন্দ্রটাচার্যের উক্তিতে—

ব্যাখ্যাতরি হরিচন্দ্রে শ্রীজেজ্জট নাম্নি সুধীরে চ।
অন্যস্যায়ুর্বেদে ব্যাখ্যা ধাষ্ট্যং সমাবয়তি॥

চন্দ্রটা চার্য্যের পিতা ছিলেন প্রখ্যাত বৈদ্য শাস্ত্রকার, নাম তীসটাচার্য্য। এর অনেক উক্তি ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার রঘুনন্দনও তার 'আহ্নিক তত্ত্বে' উদ্ধৃত করেছেন। পিতা তীসট্ পুত্র চন্দ্রট উভয়েই দশম শতাব্দীর। (৯) সিদ্ধ যোগ গ্রন্থের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার বৃন্দ কুণ্ডের বান্ধব কার্ত্তিক কুণ্ড নামে একজন বৈদ্য তিনিও যে চরকের একটি টিকা লিখেছিলেন, এবং তার উক্তি গুলি যে খুব প্রামাণ্য তা চক্রপাণি তাঁর চরকের টীকা ভাষ্যের স্থানে স্থানে উল্লেখ করেছেন। তবে সে টীকার কোন নাম ছিল না বলেই চক্রপাণি কেবল কার্ত্তিক কুণ্ডের নামই উল্লেখ করেছেন। (১০) ঐ দশম শতকেই অমৃত প্রভ নামে একজন আচার্য্য চরকের উপর একটি ভাষ্য লেখেন 'চরকন্যাস'। এরও অনেক উক্তি চক্রপাণি উদ্ধৃত করেছেন।

ঐ দশম শতকের শেষেই বাংলায় জন্ম গ্রহণ করেন বৈদ্যগুরু নরদত্ত। এরও জন্ম ভূমি যে রাঢ় অঞ্চলের কোন গ্রামে ছিল তা নিঃসন্দেহ, কারণ এখানকার মত দূর অঞ্চলে যাওয়াটা খুব সুখের ছিল না, তাই নিকটবর্তী গ্রামেই ছাত্ররা অধ্যয়ন করতেন। সপ্তগ্রাম নিবাসী (হয়তো পূর্বে বীরভূম) মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্ত মহাশয় এই নরদত্তের কাছেই আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। এ কথা তিনি বিনত হয়েই তাঁর চরক টীকায় উল্লেখ করেছেন—

নর দত্ত গুরূদ্দিষ্ট চরকার্থানুগামিনী।
ক্রিয়তে চক্র দত্তেন টীকায়ুর্বেদ দীপিকা॥

তাছাড়া তাঁর গুরু নরদত্তও যে (দশম খৃষ্টাব্দের শেষদিকে) 'বৃহৎ তন্ত্র প্রদীপ' নামে একখানি চরক টীকা নির্মাণ করেছিলেন। সে সংবাদও পাওয়া যায় চক্রপাণির টীকা থেকে। আর একটি সংবাদ ও পাওয়া যায় 'কুমার ভার্গবীয়' নামে কৌমার ভৃত্য চিকিৎসা গ্রন্থ থেকে, তাতে স্পষ্ট জানা যায় চক্রপাণি দত্তের গুরুভ্রাতা ছিলেন আরও দু'জন, গোবর্ধন দত্ত ও ভানু দত্ত। গোবর্ধন দত্ত তাঁর গুরুদেব নর দত্তের চরক টীকা 'বৃহৎ তন্ত্র প্রদীপে'র অনুগামী করে চরকের একটি টীকা লিখেছিলেন, তার নাম 'তন্ত্র প্রদীপ'

আর ভানু দত্ত ছিলেন চক্রপানির বড় দাদা। তিনিই রচনাকরেছিলেন 'কুমার ভার্গবীয়'। এ গ্রন্থের ও কিছু কিছু উদ্ধৃতি চক্রপানির টীকায় দেখা যায়।

চক্রপানি দত্ত মহাশয়ের টীকা থেকেই জানা যায়, তিনি চরক সংহিতা গ্রন্থটি যে 'চরক' নামে কোন ব্যক্তি বিশেষের রচিত নয়, ওটি অগ্নিবেশ সংহিতা এবং এ গ্রন্থ বেদের চরক শাখার অন্তর্গত, তা পরিষ্কার তিনি বলেছেন 'পরম কারুণিকো ভগবান্ অগ্নিবেশঃ অল্পায়ু মেধসাং সুখোপলম্ভার্থং নাতি সংক্ষেপ বিস্তরং কায়চিকিৎসা প্রধানং আয়ুর্বেদ তন্ত্রং আরব্ধবান্'।

চক্রপানির পরে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আরও ১১টি টিকা রচিত হয়েছে চরক সংহিতার। সেগুলির মধ্যে একমাত্র হরিশচন্দ্রই বলেছেন 'কঠ চরকা' লুক্ (পাণিনি) বয়ং চরকাঃ পর্য্যববানঃ। চরকাঃ কাম্পিল্যং ইত্যাদি উপনিষৎসূক্তি থেকে জানা যায় ভারতে এক কালে শালীন ও চরক নামে দুটি ঋষি সম্প্রদায় ছিল। শালীন অর্থাৎ যারা শালা বা কুটির নির্মাণ করে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন আর চরক যাঁরা দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করতে করতে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। সেই চরক সম্প্রদায়ই আয়ুর্বেদ বিস্তার আদি গুরু। তাঁদেরই সম্প্রদায়ের ঋষি অগ্নিবেশ। সেই অগ্নিবেশের গুরু আত্রেয়। চরক নামে কোন ব্যক্তি বা গুরু ছিলেন না। তাঁরা সকলেই ছিলেন চরক সম্প্রদায়ের পুরুষ।

চক্রপানির টীকাটি পড়লেই বোঝা যায় কেন চক্রপানিকে 'চরক চতুরানন' বলে তৎকালে গৌরব ভূষণে ভূষিত করেছেন। চরক সংহিতায় বলা হয়েছে 'ধর্মার্থ কাম মোক্ষাণাং আরোগ্যং মূল মুক্তমম্' অর্থাৎ কেউ ধর্মাচরণই করুক অথবা অর্থ সংগ্রহ সঞ্চয়ই করুক, কিংবা দেহ মনের বাসনা পরিতৃপ্ত করুক কিংবা মোক্ষাভিলাষী হয়ে যোগারাধনাদিই বা করুক সকলের মূলে থাকবে রোগমুক্ত দেহ। অতএব আরোগ্য লাভের প্রয়াস সর্বাগ্রে।

এই চারটি বস্তু বা শক্তি কি? যাদের মৌল ভিত্তি আরোগ্য লাভ। এই চারটি স্বরূপ চরক সংহিতায় দেখান হয়েছে এবং তার সঙ্গে বিস্তৃত করে বর্ণনা করা হয়েছে আরোগ্যের পথ। চক্রপানি দত্ত মহাশয় ঐ চারটি পথেরই চমৎকার সরল গম্ভীর ও বাস্তবমুখী ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝিয়েছেন। এক মুখের যেন ভাষা নয়, চারমুখে চারতত্ত্বের ব্যাখ্যা। তাই তাঁর উপাধি 'চরক চতুরানন'।

চক্রপানি দত্ত মহাশয়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'চক্রদত্ত'। এ গ্রন্থের মূল উপাদান বৃন্দ ও সুপ্রাচীন সিদ্ধ যোগ এবং চরক সুশ্রুতের ও বাগভটের সময়কার আবিষ্কৃত ঔষধের সমাবেশ থেকে। এইসব ঔষধের যোগগুলি প্রত্যক্ষ ব্যবহারগত ফল উপলব্ধি করেই তিনি এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন; তার দ্বারা বোঝা যায় চক্রপানি দত্ত মহাশয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ বোধক বাক্যগুলির অর্থ অনুশীলন করে তার বিপুল ব্যাখ্যা লিখেই জীবন অতিবাহিত করেন নাই, বহু আতুরের চিকিৎসা কার্য্যে ব্যাপৃত থেকে আয়ুর্বেদের উপদিষ্ট পদ্ধতি এবং ঔষধাবলীর অমোঘ ফল কিরূপ হয় তাও যথেষ্ট উপলব্ধি করে পরবর্ত্তি কালের চিকিৎসকদের জন্য একটি সগম 'পথ প্রস্তুত করে গিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি আদর্শ গ্রহণ করেছেন মাধব করের 'নিদান' গ্রন্থ থেকে। মাধব করই প্রথম দেখিয়েছেন চরক সুশ্রুতাদিতে বিক্ষিপ্ত ভাবে যে সব রোগ পরীক্ষার পদ্ধতি ও ব্যবস্থা নিরূপণ করা আছে, সেগুলিকে তিনি পরপর প্রণালীবদ্ধ রীতিতে সাজিয়েছেন চক্রপানি দত্ত মহাশয় ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে তেমনি পরপর রোগ অনুযায়ী চিকিৎসার সিদ্ধ যোগগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে হয়েছে এই যে বিশাল আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের জ্ঞান যদি কেউ

আয়ত্ব করতে নাও পারেন তবে, খুব সংক্ষেপে মাধব করের নিদান এবং চক্রদত্তের চিকিৎসা এই দুটি গ্রন্থের অভ্যাস থাকলেই তিনি একজন সুনিপুণ চিকিৎসক হতে পারেন।

এরই জন্য দত্ত মহাশয়কে সুপ্রাচীন আয়ুর্বেদের পঞ্চকর্মীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ছাড়াও একটি সহজ পদ্ধতিকে অবলম্বন করে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা রীতিকে অবলম্বন করার পথ প্রস্তুত করতে হয়েছে। প্রাচীন রীতিতে সব রোগেরই বমন বিরেচন আস্থাপন অনুবাসন ও নিরূহনের পথ সর্বাগ্রে বিবেচনা করার রীতি। চক্রদত্ত মহাশয় সে রীতির মুখ্যত্ব—অপেক্ষা—রোগ নির্বাচন এবং ভেষজের কষায়, চূর্ণ প্রভৃতির ব্যবস্থাপনার মুখ্যত্বই স্থাপন করেছেন।

এর সঙ্গে আর একটি নূতন পথের সন্ধান দিয়াছেন ঐ চক্রদত্ত গ্রন্থে। যেটি বাংলায় একাদশ শতকের আগে প্রবর্ত্তিতই হয় নাই। সে পথ 'রস চিকিৎসার' পথ। অর্থাৎ পারদ গন্ধক লৌহ প্রভৃতির দ্বারাও যে অমোঘ শক্তির আধার ভৈষজ্য বিধান করা যায় এবং তা আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতির বিধি বিধান অপেক্ষা আরও সহজ এটি জানিয়েছেন। এপথ দক্ষিণ ভারতে আবিষ্কৃত হয়েছিল অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় ২ | ৩শ শতাব্দীতে।

এইসব রস তান্ত্রিক ঔষধের প্রবর্ত্তন করার জন্য পরবর্তি কালের অনেক মনীষী মনে করেন চক্রদত্ত মহাশয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাদের ধারণা চক্রদত্তে নেত্র রোগের চিকিৎসায় কয়েকটি ঔষধের ফল শ্রুতিতে বুদ্ধের নাম সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু এ ধারণাটি তাঁদের যথার্থ নয়। এটি পাশ্চাত্য দেশের মনীষীদের জীবনী সংগ্রহের ধারা থেকে উদ্ভূত। চক্রদত্ত মহাশয় তাঁর গ্রন্থ অভীষ্ট বন্দনার এবং মাঝে ও শেষে ভারতীয় সংস্কৃতির চরম অভীষ্ট ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের প্রতি প্রণতি নিবেদন করে জানিয়েছেন বুদ্ধ নামটি তিনি আর একটি সংস্কৃতির সূচক হিসাবেই গ্রহণ করেছেন, ওটি নিজের সংস্কার বদ্ধ চিত্তের অভিনিবেশ নয়।

তৃতীয় গ্রন্থ 'দ্রব্যগুণ সংগ্রহ'। এই গ্রন্থটির রচনার জন্য চক্রপাণিকে বহু আয়ুর্বেদীয় ও তান্ত্রিক গ্রন্থের দ্রব্য বিচার কিরূপ এবং সে বিচারে দ্রব্যের প্রাধান্য কি গুণের প্রাধান্য অথবা রস বীর্য্যের প্রাধান্য উল্লেখিত হয়েছে, সে বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছে। তাই তিনি গ্রন্থের শেষে পরিষ্কার বলেছেন—

তন্ত্রাণাং সারমাকৃষ্য দ্রব্যাণাং গুণসংগ্রহঃ।
ভিষজামুপ করায় রচিত শ্চক্রপাণিনা॥

চক্রপাণি দত্ত মহাশয় এই যে বল্লেন আমাকে অনেক তন্ত্র দেখতে হয়েছে তবেই তাদের সার সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, এটি যে কতখানি মেধা ও অধ্যবসায়ের ফল তা যাঁরা তাঁর দ্রব্যগুণ সংগ্রহ গ্রন্থখানি অভ্যাস করবেন তাঁরাই এ কথার মর্ম উপলব্ধি করবেন। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখেছি চক্রপাণির 'দ্রব্য গুণে' যে সব গ্রন্থের বচন সংগৃহীত হয়েছে সেগুলি অদ্যাবধি মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায় না, তবে পুঁথির আকারে পাওয়া যায়—কিছু পুঁথি আমাদের বাড়ীতে পুরুষানুক্রমে সংরক্ষিত হয়ে আছে কিছু সংস্কৃত গ্রন্থাগারে, কিছু বরাহ নগর পাটবাড়িতে শ্রীমদ্ রাম দাস বাবাজী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরে—। চক্রপাণি দত্ত মহাশয়ের 'দ্রব্যগুণ সংগ্রহে' এই সব পুঁথির বচন বিধৃত হয়েছে—(১) চরক (২) সুশ্রুত (৩) বাগভট (৪) ন্যায় দর্শন (৫) জতুকর্ণ (৬) মাধব কর (৭) বিশ্বামিত্র (৮) ডল্বন (৯) গয়দাস (১০) চক্রপাণির নিজেরই রচিত (১১) হারীত (১২) বাপ্যচন্দ্র (১৩)

ত্রিবিক্রম (স্মৃতি) (১৪) পরাশর (স্মৃতি) (১৫) ব্রহ্মদেব (১৬) কাশিরাজ (১৭) বৃদ্ধ বাগভট (১৮) ভটার হরিচন্দ্র (১৯) চন্দ্রিকাকার (ব্যাকরণ) (২০) পুরুষোত্তম (ব্যাকরণ) (২১) ভোজদেব (২২) জেজ্জট (২৩) অগ্নিবেশ তন্ত্র (২৪) নলপাক।

চক্রপাণি দত্তের দ্রব্যগুণ সংগ্রহ গ্রন্থটির অনুশীলনে যে কোন চিকিৎসকের পক্ষে যে আয়ুর্বেদীয় চিন্তাধারায় দ্রব্য বিচারটি সম্পূর্ণ হয়ে যায় তা নিঃসন্দেহ।

এঁর চতুর্থ গ্রন্থ 'বৈদ্যক শব্দাভিধান'। এ গ্রন্থের আদর্শ আট রকমের পর্যায় মুক্তাবলী। এবং অমর সিংহের 'অমরকোষ' এবং জৈন সম্প্রদায়ের অভিধান চিন্তামণি। পূর্বোক্ত গ্রন্থাবলী আদর্শ হলেও কেবল বৈদ্যক সম্প্রদায়ের ব্যবহার্য পরিভাষাগুলি নিয়েই চক্রপাণি দত্ত মহাশয় একটি পৃথক অভিধান রচনা করেছেন। সামগ্রিকভাবে চক্রপাণিকে অধ্যাবন করলে জানা যায়, সংস্কৃত ভাষা অনুশীলনকারিদের পক্ষে যেমন ব্যাকরণ, কোষ প্রয়োগপুস্তির সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থপাঠ অপরিহার্য, তেমনি একমাত্র চক্রপাণি দত্তের রচিত চরক টীকা, চক্রদত্ত, দ্রব্য গুণ সংগ্রহ ও শব্দাভিধান এই চারিখানি গ্রন্থ বৈদ্যদের অপরিহার্য পাঠ্য।

বাংলার বৈদ্যক সম্প্রদায়ে এত বড় প্রতিভাশালী গুরুর আবির্ভাব এই বিশ শতাব্দীতেও হয় নাই। যদিও আর এক অবিস্মরণীয় বৈদ্যগুরু গঙ্গাধর রায় মহাশয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে (১৭৯৮ খৃঃ) আবির্ভূত হয়ে চক্রপাণি দত্ত মহাশয়ের প্রতিভার অভিজ্ঞান রক্ষা করে গিয়েছেন, কিন্তু বৈদ্যগুরু দত্ত মহাশয়ের মৌল অবদানকেই তিনি পরিশীলন করেছেন। তাছাড়া করেছেন বৈদ্য সম্প্রদায়ের অনেক অপূর্তকামনার পূর্তিসাধন।

রাঢ় দেশে চক্রপাণি দত্তের নাম কেবল একমাত্র বৈদ্যকুল গুরু চরকাদি গ্রন্থের টীকাকার, চক্র দত্তের রচয়িতা সেই প্রসিদ্ধ পুরুষেরই নয়। দত্ত উপাধি অথচ প্রখ্যাত গ্রন্থকার আরও ছিলেন।

(১) 'সংক্ষিপ্ত-সার' ব্যাকরণ রচয়িতা মহামহোপাধ্যায় ক্রমদীশ্বর দত্ত মহাশয় নিজের পরিচয় দিয়েছেন আমি চক্রপাণি দত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং শ্রীপতি দত্তের নাতি। চক্রপাণিস্থতো জ্যায়ান্ নপ্তাসৌ শ্রীপতেঃ কৃতী। এঁরা ছিলেন রাঢ়ীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ ও চৌপীড়া গ্রামের অধিবাসী। (২) দ্বিতীয় চক্রপাণি দত্তের জামাতা ছিলেন বৈদ্যকুল পঞ্জিকাকার মহাত্মা দুর্জয় দাশশর্মা। (৩) শক্তিগোত্রীয় চক্রপাণি দত্ত। ইনি নিজেকে পানিঠাকুর বলেই খ্যাপিত করে গিয়েছেন। যেটি চন্দ্রপ্রভাকার ভরত মল্লিক তাঁর গ্রন্থের ২৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। (৪) 'শার্ঙ্গধর প্রকাশ' নামে আয়ুর্বেদ সংহিতার রচয়িতা আরুমল্ল ছিলেন অপর এক চক্রপাণি দত্তের পৌত্র। (এটি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ও স্বীকার করেছেন তাঁর হিন্দু কেমিষ্ট্রি গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে)।

বাঙালী জীবনে বিবাহ ॥ শঙ্কর সেনগুপ্ত। ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন্‌স্, ৩ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১, মূল্য ৩০, পৃষ্ঠা ৫১২ সন ১৯৭৪

শঙ্কর সেনগুপ্ত 'বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি'-র পর উপহার দিয়েছেন 'বাঙালী জীবনে বিবাহ' সমাজ-ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি একাধিক কারণে প্রতিটি বাঙালীর সম্পদ হতে পারে। প্রথমে এই গ্রন্থ পাঠে সুপ্রাচীনযুগ থেকে অত্যাধুনিক যুগ অবধি বাঙালীর সমাজ-জীবনের একটি পরিচ্ছিন্ন চিত্র পাই। সমাজ-জীবনের এই চিত্রটি সম্পর্কে অনবহিত থেকে বাঙালী জীবনে বিবাহের আলোচনায় স্পষ্টতা আসে না, আসতে পারে না। এই সত্যটি লেখকের উপলব্ধিতে ছিল বলেই তিনি দুই শতাধিক পৃষ্ঠা বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের আলোচনায় ব্যয় করেছেন। এখানে বাঙালী হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, ক্রীশ্চান, ব্রাহ্ম, আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্ম বৃত্তান্ত, কৌলীন্য ও মর্যাদাবোধ, শাখা, গোত্র, প্রবরাদি সম্পর্কে জানতে পারি। জানতে পারি হিন্দুদের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাক, সাহা, সুড়ি, তাঁতী, বণিকাদির কথা, অনুন্নত আদিবাসী ও উপজাতি গোষ্ঠীর কথা জানতে পারি। মুসলমান সমাজের জাতিভেদ, মর্যাদাবোধ এবং শ্রেণীবিভাগের কথাও। এই গ্রন্থ পাঠে দেখি মুসলমান সমাজে নাকি প্রায় আশী রকমের জাতিভেদ বিদ্যমান, যদিও তাঁরা মূলত চারটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত—শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান। হিন্দু সমাজও মূলত চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। কিন্তু হিন্দু সমাজের এই বর্ণবিভাগ বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে দৃশ্য নয়। এখানকার বর্ণবিভাগ অন্য প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কবে থেকে বাঙলায় বৈদ্যদের আগমন হয়, কবে থেকে কায়স্থ সমাজ বাঙলার শাসকদের মসনদ অধিকার করে বসেন, কবে থেকে মাহিষ্য সম্প্রদায় তাদের গোষ্ঠী নির্দিষ্ট করতে পারেন, সাহা, সুড়ি, নমঃশূদ্র, বাউরী, বাগ্দী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে কীভাবে মর্যাদা বিভাগ দেখা যায়, উগ্রক্ষত্রিয়, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়াদি জাতির মর্যাদা বিভাগ কীভাবে অনুষ্ঠিত হয় অস্পৃশ্য অশৌচ সম্প্রদায় কীভাবে বিবাহাদি কর্ম সম্পাদন করেন তার সবিস্তার বর্ণনা আছে আলোচ্য গ্রন্থে, বাঙলায় কৌলীন্যপ্রথা বল্লাল প্রতিষ্ঠিত করেন না তাঁর আগেও কৌলীন্য প্রবর্তিত ছিল, আদিশূর কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি কী না, এ সব বিষয়েও কৌতূহলদীপক আলোচনা আছে। কীভাবে পঞ্জিকা বিবাহ ব্যাপারে নিয়ামকের আসন লাভ করতে সক্ষম হয় তাও চমৎকারভাবে উত্থাপিত হয়েছে। লৌকিবিচার, লগ্ন নির্ণয়, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন, পাত্র-পাত্রীর বয়স, প্রাক বিবাহ পরিচয়, বিবাহিত ভ্রম, দেশে দেশে বিবাহ কীভাবে প্রথাবদ্ধ হয় তার বিবরণ, বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মধ্যে শাস্ত্রাচার এ লৌকাচারের পার্থক্য প্রভৃতির আলোচনান্তে লেখক এক একটি স্বতন্ত্র পাঠে হিন্দুবিবাহ, মুসলমানী বিবাহ, বৌদ্ধ বিবাহ, ক্রীশ্চান ও ব্রাহ্মসমাজীদের বিবাহের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাছাড়া আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের বিবাহের আলোচনায় সাঁওতাল, মুণ্ডা, খেড়িয়া, মহালী,

ওঁরাও, লোচা, টোটো, রাজবংশী, কোচ, বাভা, লোধা, কর্মীমাহাত এবং বাউরীদের বিবাহাচার পদ্ধতির বিশদ বিবরণ আছে। ইতিপূর্বে অন্য কোন বাংলা গ্রন্থে সমগ্র বাঙালীর বিবাহাচার পদ্ধতির এ ধরণের আলোচনা প্রকাশিত হয় নি। সেদিক থেকে এ গ্রন্থ শুধু বিশিষ্টতাই দাবী করতে পারে না, পথিকৃতের আসনও দাবী করতে পারে।

হিন্দু বিবাহের আলোচনায় বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ অবধি কীভাবে বিবাহ বিবাদ বিবর্তিত হয়েছে—বিভিন্ন বেদ অনুসারী হিন্দু কীভাবে বিবাহাচার পদ্ধতি পালন করেন, যুগে যুগে হিন্দু নারীর অধিকার ও মর্যাদা কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে তার আলোচনা আছে। আলোচনা আছে বিবাহিত প্রেম সম্পর্কেও। এবং স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্য দূরীকরণের ব্যাপারে উভয়কে কীরূপ আচরণ পালনীয় সে সম্পর্কে উপদেশ।

মুসলমানী বিবাহের আলোচনায় মুসলমান নারীর অধিকার, তালাক পতি, গত হবার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশাদি ব্যাপারে বিশদ আলোচনা আছে। বাঙালী মুসলমানের কথা বার্তায় ও আচার-আচরণে হিন্দু আচার আচরণের ছায়া দেখতে পাই। তাই দেখি ওদের মধ্যে সিন্দুরের প্রচলন, দেখি হরিদ্রার ব্যবহার এবং আরও নানা কৃত্য। বাঙালী বৌদ্ধদের বিয়ের ব্যাপারেও চমৎকার আলোচনা দেখি। এই গ্রন্থ পাঠে সমাজ ইতিহাসের এমন সব চিত্তাকর্ষক তথ্য বেরিয়ে এসেছে যা বাঙালীর স্বাতন্ত্রতা বুঝতেই সাহায্য করে না—বাঙালীর জন্মবৃত্তান্তের প্রামাণিকতাও জাগিয়ে দেয়।

একটী চমৎকার বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বিষয়টি ফুলশয্যা। বাঙালীর ফুলশয্যা বা বিবাহের পরের দিন বাদ দিয়ে অনুমিত হয় তা শাস্ত্র অনুমোদিত কী না! শ্রী সেনগুপ্ত বলেছেন, এটা শাস্ত্রাচার অনুমোদিত নয়। অত্যন্ত সরস ঢঙে তিনি শয্যা সম্পর্কিত আলোচনাটি রেখেছেন। তিনি বলেছেন যে মানুষ শয্যাপ্রাণী। পৃথিবীর এমন কোন কাজ নেই যার জন্য মানুষ এত দীর্ঘ সময় ব্যয় করে যেমন করা হয় শয্যার স্থান। জীবনের অন্ততঃ একতৃতীয়াংশ সময় কাটে শয্যায় শুয়ে। চমৎকার এই গ্রন্থখানি রচনা করে শ্রী সেনগুপ্ত একটি মহৎকার্য সম্পাদন করলেন।

বিমল মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি

লোকসংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক ও অনুরাগীদের

পক্ষে একটি আবশ্যক সংকলন গ্রন্থ

মূল্য : সাড়ে পাঁচ টাকা

বিষয় ও লেখকসূচী

বাংলার লোক-সাহিত্য—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ◦ বাংলার লোকনাট্য—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ ◦ পশ্চিমবঙ্গের লোক-নৃত্য—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ◦ লোকসংস্কৃতি বিকাশের পশ্চাৎপট ও বঙ্গদেশ—ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় ◦ লোক-সাহিত্যের ভাষা—ডঃ সুকুমার সেন ◦ বাংলার লোক-সাহিত্য ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য—শ্রীগোপাল হালদার ◦ বাংলার লোক-সঙ্গীত—শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র ◦ পশ্চিমবঙ্গের লোক-উৎসব—ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিক ◦ বাংলার লৌকিক ভাষা—ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক ◦ বাংলার লৌকিক দেব-দেবী—শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু ◦ বাংলার লোক-শিল্প—ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ◦ বাংলার লোকধর্ম—ডঃ সুধীররঞ্জন দাশ ◦ বাংলার মৃৎশিল্পের সমাজতত্ত্ব—শ্রীবিনয় ঘোষ ◦ পশ্চিমবঙ্গের নবপর্যায়ের মন্দির চর্চা (১৫ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ১১০০) উৎসব সন্ধান ও চরিত্র বিচার—শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যাল ◦ বাংলার লোক-সংস্কার ও বিশ্বাস প্রসঙ্গে—ডঃ সমীরকুমার ঘোষ ◦ পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সংস্কৃতির ধারা—ডঃ অমলকুমার দাশ ◦ পশ্চিম সীমান্ত-বঙ্গের লোক-সংস্কৃতি—ডঃ সুধীরকুমার করণ ◦ উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতি —শ্রীসুশীলকুমার ভট্টাচার্য ◦ বাংলার লোকসংস্কৃতি ও প্রচারমাধ্যম—শ্রীশংকর সেনগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান

প্রকাশন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণালয়

৩৮, গোপালনগর রোড, কলিকাতা-৭০০০২৭

প্রকাশন বিক্রয়-কেন্দ্র, নিউ সেক্রেটারিয়েট

১, কিরণশংকর রায় রোড, কলিকাতা-৭০০০০১

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) ৬৩৫/৭৫